# গোপন মৃত্যু ও নবজীবন

[ প্রথম খণ্ড ]

এস. এম. জাকির হুসাইন

# গোপন মৃত্যু

# ও

# নবজীবন

# গোপন মৃত্যু

# ও

# নবজীবন

(১ম খণ্ড)

এস. এম. জাকির হুসাইন

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

৩৮/২—ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ৭১১৮৪৪৩

**প্রথম প্রকাশ:** নভেম্বর, ২০০২

**দ্বিতীয় প্রকাশ:** জুন, ২০১০

**প্রকাশক**

শরীফ হাসান তরফদার

**জ্ঞানকোষ প্রকাশনী**

৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ৭১১৮৪৪৩, ০১৭১২৭১৭১৮

**E-mail:** gyankoshprokashoni@gmail.com

gk_tarafder@yahoo.com



প্রচ্ছদ

এস. এম. মামুন

**কম্পোজ**

Paradigm Computers

Khilgaon, Dhaka-1219

**মুদ্রণ**

**নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স**

**১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫**

**ফোন: ৯৬৬৭৯১৯**

**ISBN: 984-8485-81-3**

মূল্য: ১৪০ টাকা মাত্র

**Price: Tk. 140 Only**

**Gopon Mrityu O Nabojibon (part—1)**

**(Secret Death and Ressurrection)**

**by—S. M. Zakir Hussain**

**GYANKOSH PROKASHONI**

**38/2-Ka, BANGLABAZAR, DHAKA-1100**

## উৎসর্গ

*১/ রাহাত রেজা সিদ্দিকী (জীবন)*

*২/ মহি-উদ্-দীন*

*৩/ কামরুজ্জামান*

*৪/ আরিফ খান*

এই বইটির জন্য আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যদি কোনো পুরস্কার দেন, তাহলে তিনি যেন তার পূর্ণটুকু তোমাদেরকে দান করেন—ইহকালে এবং পরকালে—আমীন।

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

সঠিক উপায় অবলম্বন করতে পারলে হয়তো মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ই আমরা যার যার ঘরের অন্ধকার কোনায় ব'সে বা দাঁড়িয়ে হঠাৎ ক'রে ম'রে গিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে বেঁচে উঠতে পারি। কোনো তত্ত্বকথা বা গুরুমন্ত্র নয়—আমরা সন্ধান করব বাস্তব পদ্ধতি। শুধু তাই নয়, যেহেতু আমরা সন্ধান করছি যাবতীয় জটিলতা থেকে মুক্তি, সেহেতু আমরা কোনো পদ্ধতিগত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করব না। কোনো ব্যবহারিক পদ্ধতি কখনও জটিল হতে পারে না।

বইটির মূল উপজীব্যকে গল্পের আশ্রয়ে উপস্থাপন করেছি, যেমনটি করেছিলাম আগের দুটি বইতে। কিন্তু এবারের গল্পগুলি একটু বেশি প্রতীকী (Symbolic)। একটি কথা শুরুতেই ব'লে রাখা ভালো: বইটি কেবল তাদের জন্যই যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সাগ্রহে সক্রিয়, তাদের জন্য নয় যারা শুধু আলোচনার খাতিরে আধ্যাত্মিকতা পছন্দ করেন। এবং লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠকগণের মধ্যে এমন কিছু অবশ্যই থাকবেন বইটি পড়ার সময়েই যাদের অন্তরের কিছু গ্রন্থি, কিছু জটলা একটু একটু ক'রে খুলতে থাকবে। কারণ বইটি লেখার সময়ে লেখকেরও তাই হয়েছে। অবশ্য এমনও কয়েকজন পাঠক এই বইটি পাবেন যারা এটিকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক-বার পড়বেন এবং যাদের কাছে বইটিতে উপস্থাপিত বিভিন্ন রূপক গল্পের অন্তরালে লুকায়িত আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনার বিভিন্ন মাত্রা বহুভাবে বহুদিন ধ'রে প্রকাশিত হতে থাকবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত গল্পগুলির মধ্যকার লুকায়িত যোগসূত্র অনুভূত হতে থাকবে। এ কৃতিত্ব লেখকের নয়, তাদেরই, কারণ সত্যের চরিত্রই এরূপ এবং আল্লাহ্‌র করুণা ছাড়া কেউ সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অপরপক্ষে যারা কেবল যুক্তির অনুসারী, প্রেম বাদে, এবং যারা নিজেদের বিরোধিতা করায় অনভ্যস্ত, তাদের কাছে বইটির অনেক কিছুই হাস্যকর মনে হবে। সরাসরি যারা মন নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কারবার করতে চান, শুধু চিন্তা ও বিশ্লেষণ নিয়ে নয়, তারা অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে Religion, Philosophy—এমনকি Philosophy of Religion, Literature—এমনকি Mysticism (যা শুধু সাহিত্যরসাস্বাদনের খাতিরে চর্চা করা হয়)—এগুলো আদৌ এক কথা নয়। এই বইটির উদ্দেশ্য হলো সরাসরি কেন্দ্রের দিকে যাত্রা। এমনকি পথ খোঁজাও নয়। সারা পৃথিবীর তথা মহাবিশ্বের সুন্দরতম স্থানগুলির মানচিত্র জানা আর ভ্রমণ করা এক কথা নয়।

একথা তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবিগণ' না বুঝতে পারলেও সরল মনের যে-কোনো সাধারণ ধার্মিকমাত্রেই ভালোভাবে বোঝেন।

বইটিতে যে রূপকগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা একই সাথে চিন্তা, আগ্রহ, এবং মনের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে উস্কে দিয়ে সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ গতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাতে কষ্ট হলেও ধৈর্য ধরতে হবে। সেখান থেকে নবজীবনের অনুসন্ধান শুরু হবে। মনটা জাগ্রত হলে তাকে যে সূক্ষ্ম সরলরেখা বরাবর চালিত করার আবশ্যিকতা দেখা যায়, তা সংঘটিত করার জন্য এখানে যে কার্যক্রম দেয়া হয়েছে তা একেবারে পরোক্ষতামুক্ত এবং সরল। সরল পথ তো সরলই হবে। কিন্তু এখানেই মহাযুদ্ধ শুরু। আল্লাহ্ আমাদেরকে জয়ী হবার যোগ্যতা দান করুন।—আমীন।

## এক

# মৃত্যুর সাথে চুক্তি

গুরুজী মোরাকাবায় (ধ্যানে) ব'সে আছেন। তাই বুড্ডা অদূরে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক্ষণ ধ'ওে দাঁড়িয়ে আছে সে। পা দুটো লেগে আছে। তাই সে কিছুক্ষণ পর ব'সে পড়ল। খানিক পর গুরুজী চোখ না খুলেই বললেন- 'ব'সে পড়।'

বুড্ডা চমকে উঠল। সে তো গুরুজীর অনুমতি না নিয়েই ব'সে পড়েছে। সুতরাং সে উঠে দাঁড়াল।

গুরুজী চোখ খুললেন।

বুড্ডা ব'সে পড়ল।

গুরুজী বললেন-'আস সালামু আলাইকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। গুরুজী আমি নতুন এসেছি। আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।'

'আমি কি বলেছি যে তোমাকে আমি আগে দেখেছি?"

'কিন্তু আমি আপনাকে আগে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'স্বপ্নে।'

'তুমি আবার স্বপ্নও দেখ নাকি?'

'জ্বী, মাঝে মাঝে। কিংবা হয়তো সব সময়ে। তবে সব স্বপ্নের কথা মনে থাকে না।'

'তার মানে তুমি সারা রাত খালি ঘুমাও? আমার কাছে তোমার দীক্ষা জুটবে না।'

একথা ব'লে গুরুজী উঠে ওপাশে সবজি-বাগানের মধ্যে ঢুকলেন গাছে পানি দেবার জন্য। বুড্ডা লজ্জায় ঠায় ব'সে রইল। সে ভাবল, এমন গুরুর কাছে ধরা দিতেই হবে। কিন্তু কিভাবে?

সে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে উঠে এলো সবজি বাগানের কাছে। বেড়া ধ'রে দাড়িয়ে রইল। গুরুজী নিজ হাতে গাছে পানি দিচ্ছেন। সে ভাবল তার কাছ থেকে কি পাত্রটা কেড়ে নিতে হবে? কিভাবে আচরণ করলে তা ভদ্রতাপূর্ণ হবে? সে জ্ঞানের তৃষ্ণায় এতই বিভোর থাকে যে কিভাবে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতে হয় তা সে প্রায়ই ভুলে যায়। সে চিন্তা ক'রে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। খানিক ভেবে অবশেষে দৌড়ে গেল গুরুজীর কাছে- 'গুরুজী, কাজটা আমি করতে পারলে ধন্য হতাম।'

গুরুজী তার দিকে বাঁকা চোখে তাঁকিয়ে বললেন-'আমি না তোমাকে বসতে বলেছিলাম?'

বুড্ডা দিকজ্ঞানহীন হয়ে সেখানেই ব'সে পড়ল। গুরুজী গাছে পানি দিয়ে তার ছোট ঘরটাতে চ'লে গেলেন।

বুড্ডা বাগানে ব'সে রইল। খানিক পর সে দেখতে পেল এক অদ্ভুত ঘটনা। গুরুজীর পানি পেয়ে সবজি গাছের সাথে লাগানো কিছু ফুলগাছে তরতর ক'রে ফুল ফুটতে শুরু করল। সে অবাক হয়ে দেখতে লাগল এই অলৌকিক ঘটনা। দেখতে দেখতে গোটা বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। সে প্লুতনেত্রে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। এমন দৃশ্য সে এর আগে কখনও দেখেনি। তবে সে বিভিন্ন গুরুর কাছে কিছু কিছু অলৌকিক কাজও দেখেছে। কিন্তু কোনো অলৌকিক কাজ দেখে সে এত তৃপ্তি পায়নি। আজ সে এমন একটা অলৌকিক কাজ দেখল যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের প্রেমের এবং কুদরতের ছোঁয়া জড়িত। সে নিজের অজান্তেই দাঁত খুলে হেসে ফেলল। কিন্তু তার জন্য আরো সুখের সংবাদ এল-'বুড্ডা এদিকে এস।'

সে এক দৌড়ে গুরুজীর কাছে গিয়ে তার সামনে বসে পড়ল।

'উঠে দাঁড়াও।'

সে উঠে দাঁড়াল।'

'তুমি না গাছে পানি দিতে চেয়েছিলে?'

'জ্বী, গুরুজী,' সে অত্যন্ত আহলাদের সাথে দ্রুত জবাব দিল।

'যাও।'

সে এক দৌড়ে পাত্রটা নিয়ে বাগানে গেল। তার এত খুশি হওয়ার কারণ দুটো- এক: গুরুজী তাকে আদেশ করেছেন এবং দুই: তারও গুরুজীর মতো ফুল ফুটাতে ইচ্ছে করছিল।

সে প্রত্যেকটা গাছে বেশি বেশি ক'রে পানি দিতে লাগল আর গুন গুন ক'রে বলতে লাগল- 'হে আল্লাহ! তুমি কত মহান! তোমাকে ধন্যবাদ। গুরুজী আমাকে গ্রহণ করেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমার আরো নিকটবর্তী হব।'

সে বাগানে পানি দেয়া শেষ ক'রে সন্দেহপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে একবার তাকাল গাছগুলোর দিকে। কিন্তু না, একটি ফুলও বেশি ফুটল না বা উজ্জ্বলতর হলো না। সে আরো আগ্রহ নিয়ে তাকাল- যদি একটি ফুল ফোটে। হঠাৎ তার চোখের সামনেই সবগুলি ফুল দল ধ'রে ঝরে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে সে নির্বাক, নিথর হয়ে গেল। তার হাত থেকে পানির পাত্রটি প'ড়ে গেল। তার বুক ভ'রে কান্না চ'লে এল। এখন সে গুরুজীকে গিয়ে কী বলবে? এসব জেনেশুনে কি গুরুজী তাকে আর দীক্ষা দেবেন?

এমন সময়ে গুরুজী আজান দিলেন। বুড্ডা দৌড়ে চ'লে গেল নামাজ পড়তে। নামাজ পড়তে গিয়েই সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে সেখানে গুরুজী একা থাকেন।

নামাজ শেষে গুরুজী বুড্ডাকে বললেন, 'এমনভাবে হাসা উচিৎ নয় যাতে অন্য কেউ তোমার দাঁত গুনতে পারে।'

বুড্ডার মনে পড়ল বাগানে ব'সে তার সেই হাসির কথা। সে লজ্জিত হলো।

গুরুজী প্রশ্ন করলেন- 'ফুল ফোটা দেখেছ কখনও?'

বুড্ডা চমকে উঠল।- 'জ্বী, গুরুজী। তখন হেসে উঠেছিলাম।'

'ফুল ঝরে যাওয়া দেখনি?'

বুড্ডার মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল। সে মুখ নিচু ক'রে বলল- 'জ্বী, তাও দেখেছি। কিন্তু ঘটনাটা ভুলে যেতে পারলে ভালো হতো।'

'তাহলে তুমি ফুল ফোটার ঘটনাটাও ভুলে যেতে। ঝ'রে যাওয়ার ভয়াবহতা না দেখলে ফুটে ওঠার গুরুত্বকে অনুধাবন করা যায় না। যাহোক,

আগ্রহ থাকা ভাল, কিন্তু সন্দেহপূর্ণ আগ্রহ ভালো নয়। বরং তার চেয়ে আগ্রহপূর্ণ সন্দেহই ভালো। তাতে মনটা মুক্ত থাকে, জ্ঞানী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

বুড্ডা কৃতজ্ঞতার সাথে আশা নিয়ে গুরুজীর দিকে তাকাল। গুরুজী বললেন—'নিজেকে লজ্জা পাও?'

'জ্বী, পাই।'

'কারণ তুমি পাপী।'

'জ্বী। নিজের পাপের জন্য লজ্জা হয়।'

'তোমার পাপের সাক্ষী কে?'

'কমপক্ষে আমি নিজে।'

'তোমার সব পাপের স্মৃতি ফুলগুলোর মতো ঝ'রে যাক। কেবল ফুটে উঠলেই কোনোকিছু ফুল হয়ে যায় না। পাপের দিনগুলোর দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শেখ।'

'আমীন।'

'বেশি বেশি "ইয়া সাত্তারু" (হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী) আল্লাহর এই পবিত্র নামটি জপ করবে। আল্লাহ্‌র করুণা হলে তুমি সব ভুলে যাবে।'

'গুরুজী, স্মৃতিতে একবার কোনো কিছু লেখা হয়ে গেলে তা কি মোছা যায়?'

'কম্পিউটারে কোনো কিছু টাইপ ক'রে তা আবার মোছা যায় কিভাবে? কমান্ড দিয়ে। ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র *আস-সাত্তারু* নামটা এমন একটা শক্তিশালী কমান্ড যা তোমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকে মুছে দেবে। স্মৃতি-বিস্মৃতি সব স্তরে আল্লাহ্‌র আদেশই কাজ করে।

> আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।
>
> (সূরা শূরা, ২৪-২৭)
>
> অপরাধীরা (যেমন কাফেররা, মোনাফেকরা, এবং নফসের কুপ্রবৃত্তিরা) অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(সূরা ইউনুস, ৮২)

তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে মিথ্যাকে জাগিয়ে তোলেন এবং পরে মুছে দেন। নবুয়তির ঘটনাগুলো এভাবে ঘটে। আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি যখন যে জনগোষ্ঠীর কাছে নবী পাঠান তখন তাদের মধ্যস্থ 'বিখ্যাত' লোকদের কাছ থেকে বিরোধিতা উত্থিত করেন। সাধকের মনের মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটে। তুমি সত্যের পূজারী। তোমার মধ্যে তিনি সত্যকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আগে মিথ্যাকে না মুছে? প্রচুর তওবা পড়বে। যদিও তুমি তওবার আদব এবং শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জান না। তওবা মানুষের মন, অর্থনৈতিক অবস্থা, শারিরীক অবস্থা, সমাজব্যবস্থা, এমনকি গোটা মহাবিশ্বকে বদলে দিতে পারে। তওবার মাধ্যমে মনটাকে প্রচন্ড পরিমাণে শক্তিশালী করা যায়, মহাবিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ***ধ্যানের শক্তি এবং নবজীবন*** বইটা প'ড়ে নিয়ো। যাহোক, তোমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং মূল্যবান জিনিস কোনটা?

'বিশ্বাস। অর্থাৎ ইমান।'

'অলৌকিকের চেয়েও?'

'জ্বী। অনেক অলৌকিক কাজ দেখেছি। কিন্তু তার পরও বিশ্বাস ওঠা-নামা করেছে। আমি আল্লাহ্র কাছে কিছুই চাই না, কেবল বিশ্বাস চাই।'

'তুমি আসল জায়গাটাকে চিহ্নিত ক'রে ফেলেছ। আল্লাহ তোমার আত্মার ব্যাধি সারিয়ে দিন।'

'আমীন।'

'তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'জ্ঞানের জন্য।'

'কোত্থেকে এসেছে?'

'অজ্ঞানপুর থেকে।'

'আরেকটু দূর থেকে আসলে ভালো হতো। জ্ঞানার্জনের জন্য খুব বেশি দূরে যাওয়া দরকার। চট পরেছ কেন?'

'গুরুজী, আমি গরীব নই, দাতা।'

‘আল্লাহ্ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।’

‘আমাকে কবে স্বপ্নে দেখেছিলে?’

‘গতদিন দুপুরে।’

‘দিবাস্বপ্ন? তুমি দিনে ঘুমাও?’

‘গুরুজী, দুপুর বেলাটায় একটু ঘুমাই। রাতে ঘুমাই না। রসূলুল্লাহ (সঃ) দুপুরে বিশ্রাম করতেন। তিনি আমাদেরকেও তা করতে বলেছেন।’

‘হুঁম। তুমি যখন আমাকে স্বপ্নে দেখেছিলে তখন তুমি কোথায় ছিলে?’

‘অজ্ঞানপুরে।’

‘এত অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে এতদূর এলে কিভাবে?’

‘দৌড়ে।’

‘কারণ?’

‘জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে যাওয়ার নিয়ম। তাই ভাবলাম, পথ যখন অল্প, তখন দৌড়ে পরিশ্রম ক’রে গেলে নবীজী (সঃ) এর কথার মর্যাদা রক্ষা হবে।’

‘আল্লাহ তোমাকে জ্ঞান দান করুন।’

‘জ্ঞানের পথ কখনও ছোট হয় না। ফলে দৌড়াতে হলেও সেখানে ম্যারাথন দৌড় দরকার। আমীন।’

‘স্বপ্নে কী দেখেছিলে?’

‘দেখেছিলাম যে আপনি দুপুরে শুয়ে আমাকে স্বপ্নে দেখেছেন।’

‘তার মানে তুমি আমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলে?’

‘আমি স্বেচ্ছায় তা করিনি।’

‘আমি যে দুপুরে ঘুমাই তাও জেনে ফেলেছ?’

‘অনিচ্ছায়।’

‘তোমাকে আমার আসলেই দরকার।’

‘কেন গুরুজী? যে কারণে আমার আপনাকে দরকার সেই কারণে কি?’

‘না।’

‘তাহলে?’

‘আমি তোমাকে খুন করতে চাই।’

‘আমি জানতাম আপনি তা পারবেন।’

## দুই

# মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি

বিকেলের বাকি সময়টা বুড্ডা সবজি-ক্ষেতে কাজ ক'রে কাটাল। গুরুজী রান্না করলেন। মাগরিবের নামাজের পর বুড্ডা গুরুজীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে বসল। গুরুজীর কাছে সে জানতে চাইল—'গুরুজী, আপনি তো এখানে একা থাকেন। তাহলে এত সবজি ফলান কেন? আপনার তো সব লাগে না।'

গুরুজী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, —'মানুষের যা দরকার সে তার চেয়ে বেশি উপার্জন করে কেন?'

বুড্ডা বলল—'কারণ, মানুষ ভীরু। মানে কাপুরুষ। সে মনে করে যে বেশি বেশি উপার্জন ক'রে কম ভোগ না করলে সে সঞ্চয় করতে পারবে না। আর সঞ্চয় না করতে পারলে ভবিষ্যতের ওপর তার কোনো আস্থা আসে না।'

'ঠিক বলেছ। মানুষ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করতে জানে না। আল্লাহ্ মানুষকে কতভাবে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্-নির্ভরতা শিখিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন যে অনেক পশু আছে যারা ভবিষ্যতে খাওয়ার কথা চিন্তা করে না, সুতরাং তোমরাও আমার উপর ভরসা রাখ। অথচ মানুষ বড় অহংকারী। সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। তাই সঞ্চয় করতে চায়। সঞ্চয়ী স্বভাব হলো নারীসুলভ আচরণ।'

'কিন্তু আপনার কথাটা বুঝলাম না। আমি তো ভাবতাম—এবং এখনও ভাবি—যে, মানুষ সঞ্চয় করে তখন যখন সে নিজেকে ছোট মনে করে, যখন সে ভাবে যে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে তাকে আরো সঞ্চয় করতে হবে। অথচ আপনি বলছেন যে সঞ্চয় করে তারা যারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। কথাটা বুঝলাম না।'

'কথাটা আমার নয়। স্বয়ং তোমার আমার তথা সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের। তিনি বলেছেন:

> **...**যে কৃপণতা করেছে ও **নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করছে...**অচিরেই আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ সহজ ক'রে দেব। এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন তার অধঃপতন ঘটবে।

(সূরা লাইল, ৮-১১)

সচরাচর মানুষ মনে করে যে, যে-ব্যক্তি নিজেকে খুব ছোট মনে করে, নিজের সম্পদকে পর্যাপ্ত মনে করে না, সে-ই সঞ্চয় করে। কিন্তু আল্লাহ্ বলছেন যে আসল সত্যটা তা নয়। আসল সত্য হলো, সম্পদ সে-ই সঞ্চয় করে এবং কৃপণতা সে-ই করে যে অহংকারী, যে ভাবে যে সম্পদ খরচ না ক'রে তা জমা ক'রে রাখলে সেই সম্পদই তাকে বাঁচাবে এবং সুখ দেবে, যার ফলে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তাকে আর কারো ওপর নির্ভরশীল থাকা লাগবে না। কৃপণ ব্যক্তির মনের গভীর ধারণাটা সম্বন্ধে সে নিজেও সচেতন নয়, অথচ আল্লাহ্ তাকে তা জানিয়ে দিচ্ছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অর্থনীতিবিদও বলেন যে, কৃপণতা করলে এবং সম্পদ সঞ্চয় করলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায়। তারা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করতে চান না, নির্ভর করতে চান নিজের যোগ্যতার ওপর। এই আয়াতটাই একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কোরআন কোনো মানুষের রচনা নয়। এত সংক্ষেপে কৃপণ সঞ্চয়শীল মনোভাবের গোপন দিকটাকে তুলে ধরার যোগ্যতা আজও পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি, অথচ পৃথিবীর আধুনিক বিপ্লবগুলো হয়েছে সঞ্চিত সম্পদের শক্তির দ্বারাই।'

'কিন্তু গুরুজী, আপনি তো বললেন না আপনি কেন এত বেশি সবজি ফলান।'

'যার যা দরকার তাকে তার চেয়ে বেশি দেয়ার জন্য।'

'কিন্তু তাহলে তো মানুষ সঞ্চয়ী হয়ে উঠবে।'

'সুন্দর বলেছ।'

'কিন্তু বেশি পেয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেও তো ইহুদীদের মতো আচরণ ক'রে ফেলতে পারে।'

গুরুজী না হেসে পারলেন না। বললেন, 'মন্দ বলনি। কিন্তু বেশি দেয়াই নিয়ম। তা না হলে সঞ্চয়ের বোঝাটা আমার ঘাড়েই চাপবে।'

খানিক পর গুরুজী গণিতের অধ্যপকের মতো ভ্রুর মধ্য দিয়ে উঁকি মারার মতো ভঙ্গিতে বুড্ডার দিকে তাকালেন। বুড্ডা জড়সড় হয়ে বসল। গুরুজী বললেন, 'তুমি কী চাও?'

'মুক্তি,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সে।

‘আর তাই ঘর থেকে বের হয়ে এলে?’

‘আমার কোনো ঘরের দরকার নেই—একথা যখন জানব, তখন ঘরে ফিরে যাব, ইনশাল্লাহ।’

‘গত কতদিন যাবৎ কোনো সংসারে বাস করনি?’

‘তিন মাস আগে এক সাধক-বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। সে আমাকে ওখানেই থাকতে বলেছিল। কিন্তু তার ঘরের ভেতরটা ভালো হলেও বাইরের অবস্থাটা আমার পছন্দ হয়নি।’

‘যেমন?’

‘বাড়িটার ছাদে উঠলে চাঁদ দেখা যেত না।’

‘আর?’

‘রাতে বৃষ্টি হতো। ফলে ঘুম আসত।’

‘এখন বৃষ্টি হলে কী কর?’

‘ভিজি।’

‘নাকি ভিজতে বাধ্য হও?’

‘ভিজতে বাধ্য হলে সহজে ঘুমানো যায় না। ওটাই ভালো, ঘুমকে মৃত্যুর মতো মনে হয়।’

‘হ্যা, আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন যে ঘুমটা মৃত্যুরই মতো, তবুও কেউ ঘুমাতে ভয় পায় না, যদিও সবাই মরতে ভয় পায়। আর এভাবে তারা জীবনের উদ্দেশ্য এবং মৃত্যুকেও ভুলে যায়। কেবল তোমার মতো পাগলরাই ঘুমাতে ভয় পায়। আর কী সমস্য ছিল?’

‘স্বপ্ন।’

‘স্বপ্ন?’

‘জ্বী, স্বপ্ন। ও বাড়িতে সবাই বেশি বেশি স্বপ্ন দেখে।’

‘তাতে তোমার কী?’

‘ও বাড়িতে একটা শিশু আছে—চার বছরের শিশু—সে প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠত। বলত—আমার বুড্ডা চাচাকে মের না, ছেড়ে দাও। সে প্রত্যেক দিন আমাকে স্বপ্নে দেখত। সে দেখত যে পৃথিবীর সবাই তাকে ঘৃণা করে আর শুধু আমি তাকে ভালোবাসি। এর ফলে মা-বাবার ওপর তার ভালোবাসা ক’মে যেতে লাগল। সে দেখত যে তার মা-বাবা আমাকে প্রতিদিন লাঠি দিয়ে মারছে।’

‘আমি তোমাকে যে সব-আদেশ করব তা পালনের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকবে তো?’

‘জীবনটা তো আমার না গুরুজী, ওটা তো আল্লাহর। তিনি যখন খুশী তা নিয়ে নেবেন, তাতে আর আমার বলার কী থাকতে পারে?’

‘তোমার জীবন আর বেশিদিন নাই।’

‘জ্বী। বড়জোর বিশ-ত্রিশ বছর। কিংবা এক মিনিট।’

‘তার আগেই মরা চাই।’

‘আপনি একজন সফল হত্যাকারী।’

‘এবং তারপর মুক্তি।’

‘আহ!’

‘যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, অস্থিরতা, অনাস্থার অবসান। পরম শান্তি।

‘তারপর আবার নবজন্ম।’

‘তাহলে আগামীকাল সকালে উত্তর-পশ্চিম দিক বরারবর যাত্রা করবে। প্রায় দশ ঘন্টার পথ পার হয়ে দেখবে একটা পাহাড়, পাশে বড় একটা মালভূমি। ঐ পাহাড়ের ওপর আমার এক বন্ধু এবং শিষ্য থাকে। সে মরণবিদ্যায় অভিজ্ঞ। ওর কাছে গিয়ে বলবে যে মৃত্যু তোমাকে তাড়াচ্ছে।’

তিন

# আগুন আছে, আলো নেই

বুড্ডা মাগরিবের নামাজের আগেই নতুন গুরুর আশ্রমে গিয়ে পৌঁছাল। সেখনে তিনি একা থাকেন না। তার সাথে আরো অনেক সাধক থাকেন। অদূরে একটা লোকালয়ও আছে। সে জামায়াতে নামাজ পড়ার পর গুরুকে খুঁজতে লাগল।

গুরুজী নামাজে ইমামতি ক'রে হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন বুড্ডা তা দেখতে পায়নি। সে অন্যান্য সাধকদের কাছে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেউই তার সাথে কথা বলল না। আবার কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহারও করল না। সে এর রহস্যটা বুঝতে পারল না। তাই সে একাই এ-ঘর থেকে ও-ঘরে খোঁজ ক'রে দেখতে লাগল। কাউকে গুরু ব'লে সন্দেহ হলে সে প্রশ্ন করতে লাগল—আমি কি আপনার কাছে এসেছি? কিন্তু সবাই তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। সে এভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক খুঁজল। অতঃপর একটা গাছের নিচে ব'সে পড়ল বিশ্রামের জন্য। সে এখানকার অভিনব পরিবেশ এবং রীতিনীতি নিয়ে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার হালকা তন্দ্রার ভাব এল। এমন সময়ে সে একটা বাণী শুনতে পেল—'তুমি কাকে চাও?'

সে নড়েচড়ে ব'সে চারদিকে একবার দেখে নিল। অতঃপর বলল—'যাকে আমি খুঁজছি?'

'তোমাকে কি কেউ খুঁজছে?'

'জ্বী। মৃত্যু।'

'পাচ্ছে না?'

'যে-কোনো মুহূর্তে পেয়ে যেতে পারে।'

'কারণ?'

'নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু ধ'রে রেখেছি যা আমার নয়,তার। সে তা ফেরৎ নিতে আসছে।'

'দিয়ে দাও।'

'কিন্তু কী কী তার আর কী কী তার নয় তা আমি এখনও জানতে পারিনি।'

'সে তো তোমাকে মাঝ-পথে ধ'রে ফেলতে পারত।'

'এ কারণেই মনে হয় যে **কোনো পথই মাঝ-পথ নয়, পথের যে কোনো বিন্দুই তার শেষ।'**

'পাশের লোকালয়ে গিয়ে একটা মোম জ্বালিয়ে নিয়ে এস।'

সে আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল কোনো মোম পাওয়া যায় কি না। কোথাও ভুলক্রমে একটা মোম প'ড়ে থাকতে পারত। কিন্তু এত অন্ধকারে মোম খুঁজতে গেলেও একটা মোম দরকার। তার মনে পড়ল তার বাবার কথা। মাঝে-মাঝে তিনি তার চশমা খুঁজে না পেলে বলতেন—কেউ আমার চশমাটা দে তো, খুঁজে দেখি চশমাটা কোথায় ফেললাম। **চশমাটা যখন হারায় তখন তা এমন সব ছোট-খাট জায়গায় লুকিয়ে থাকে যেখান থেকে তা বের ক'রে আনতে গেলে চশমা লাগে।** বুড্ডা অনন্যোপায় হয়ে এক দৌড়ে লোকালয়ের দিকে চ'লে গেল। সেখানে গিয়ে সে প্রথমে যে-ঘরটা দেখতে পেল তার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে আশ্বস্ত হলো যে ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে এবং এক বৃদ্ধ তার আলোয় বই পড়ছেন। সে অনুমতি চাইল—'ভেতরে আসতে পারি?'

'আগে পারতে না, এখন পার।'

সে ঘরে ঢুকেই লোকটাকে সালাম দিল।—'আমাকে একটু আলো দেবেন?'

বৃদ্ধ তাকে আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল—'নিয়ে যাও।'

'তাহলে একটা মোম দিন।'

বৃদ্ধ তার মুখের দিকে আবারও তাকাল। খানিক পর বলল—'এটাই নিয়ে যাও। **আলোটা রেখে মোমটা দিয়ে যেয়ো।'**

বুড্ডা খানিক ভেবে বলল—'পাকা কথা দিতে পারব না।'

সে মোম নিয়ে দৌড়াল। গাছটির নিচে এসে মোম-হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

আদেশ এল—'নিভিয়ে ফেল।'

সে মোমটা—'নিভিয়ে ফেলল।'

'যার মোম তাকে দিয়ে এস।'

সে আবারও দিল দৌড়। সে মোমের মালিকের কাছে গিয়ে বলল—'আমাকে একটু আলো দেবেন?'

'কেন?'

'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। মোমটা ফেরত দিতে চাই।'

'তাহলে যে তোমাকে কষ্ট ক'রে পাশের বাড়ি তেকে একটু আগুন আনতে হবে। **আগুন ছাড়া আলো হয় না।'**

'পাশের বাড়ি কত দূরে?'

'পাশের বাড়ি তো পাশেই থাকে।'

সে তাকিয়ে দেখল যে পাশের বাড়িটা প্রায় দুইশ' হাত দূরে। সে সেখানে গিয়ে বলল—'একটু আগুন চাই।'

জবাব এল—'আগুন আছে, আলো নেই। চলবে?'

সে পাল্টা প্রশ্ন করল—'সে কেমন? '

'**তুষের আগুন**। বাতের রোগীর পা গরম করার জন্য।'

সে ফিরে এল বৃদ্ধের কাছে। জিজ্ঞেস করল—'আপনার কি বাতের রোগ আছে?'

বৃদ্ধ বলল—'আগে ছিল, এখন নাই।'

'কিভাবে?'

'আগুনে যা সারেনি, তা আলোয় সেরে গেছে।'

'সে কেমন?'

'গুরুর দোয়ায়।'

'মোমটা কি নেবেন?'

'আলোটা রেখে দিয়েছ তো?'

‘সে আলোয় আগুন ছিল।’

‘আমার আগুন দিয়ে আমার মোমটুকু জ্বালিয়ে দিতে। আলোটুকু তোমার হয়ে যেত, মোমটাও ফেরৎ দেয়া লাগত না।’

‘জানতাম না। তাছাড়া নিষেধ ছিল।’

‘ওখানে রেখে চ’লে যাও।’

সে আবারও ফিরে এল যথাস্থানে। তাকে লক্ষ্য ক’রে বলা হলো—‘মৃত্যু আসে মোম ফেরৎ নিতে। সে আলো নেয় না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার পুরোটাই মোম। দ্রুত জ্বালিয়ে আলোটুকু নিয়ে নিতে পারলে ভালো করতে। তুমি জান না যে তুমি মোম নও। তুমিই আলো। অথচ তুমি এখনও মোমের মধ্যেই রয়ে গেছ। তোমাকে প্রচুর জ্বালানী দেয়া হয়েছিল, অথচ তুমি তা ব্যবহার করনি, শুধু অপচয় করেছ।’

বুড্ডা প্রশ্ন করল—‘কিন্তু এতদিন তো জানতাম মৃত্যু এসে আলো নেয়, অর্থাৎ রূহটা নেয়।’

‘রুহের আবার মৃত্যু কী? মৃত্যু আর মৃত্যুর ফেরেস্তা এক নয়। মৃত্যুর ফেরেস্তার সান্নিধ্যে কেউ মারা পড়ে, কেউ জেগে ওঠে। তোমার অবস্থা মারা পড়ার মতো।’

একথা শুনে বুড্ডা কাঁপতে লাগল। সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

আওয়াজ এল—‘আমার কাছে এস।’

বুড্ডা তাকিয়ে দেখল যে আশ্রমের পেছন দিয়ে এক চিলতে আলো চ’লে গেছে বেশ দূরে ছোট একটা ঘরের দিকে। সে সেদিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে সে দেখল যে গুরুজী ব’সে আছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আট-দশজন সাধক। তারা বারবার বলছে—‘গুরুজী, আমরা আপনার কাছে এসেছি।’

গুরুজী কিছুক্ষণ পর বললেন—‘কিভাবে বুঝলে?’

তারা গুরুজীর কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। সবাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এমন সময়ে বুড্ডা তাদের ভিড় ঠেলে গুরুজীর সামনে গিয়ে বললেন—‘গুরুজী আমি আপনার কাছে আসতে চাই।’

গুরুজী ধ্যানস্থ অবস্থায় চোখ বন্ধ রেখেই বললেন—‘পথ খোঁজো।’

‘আপনিই নিজ দয়ায় দেখিয়ে দিন।’

**‘তাহলে চোখ বন্ধ কর।’**

বুড্ডা চোখ বন্ধ করল।

বুড্ডার পদ্ধতি দেখে অন্যান্য সাধকেরা বলল—‘গুরুজী, আমরাও আপনার কাছে আসতে চাই।’

‘তাহলে বুড্ডার পিছু নাও।’

কিন্তু ততক্ষণে বুড্ডা লাপাত্তা। সে ওখানে কোথাও নেই। তারা বললেন—‘গুরুজী, সে এখানে নেই।’

গুরুজী বললেন—‘খোঁজ।’

‘কিভাবে গুরুজী?’—সবাই একত্রে ব’লে উঠল।

গুরুজী বললেন—‘চোখ বন্ধ কর।’

তারা চোখ বন্ধ করল। কিন্তু তারা অন্ধকার ছাড়া কেউই কিছু দেখতে পেল না। ফলে তারা কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল। কিন্তু ততক্ষণে গুরুজীও আর সেখানে নেই। এই দৃশ্য দেখে তাদের মধ্যে একটু বয়স্ক গোছের এক সাধক বললেন—‘বারবার চেষ্টা করতে হবে। এবারও হলো না।’

চার

## মৃত্যুর মুখোমুখি

বুড্ডা চোখ বন্ধ করতেই দেখল যে সে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে প’ড়ে গেল। সে যেই তার মধ্যে পড়ল, অমনি গর্তটির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, কারণ এ গুরুর ইচ্ছা এবং আদেশ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হলে গুরুজী নিশ্চয়ই এরূপ ইচ্ছা করতেন না। কিন্তু সে কোনো পথ পাচ্ছিল না। এদিকে কোনো আলোও নেই। সে আরবিতে তেলাওয়াত করল:

> শপথ রাতের, যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা আবির্ভূত হয়।......
>
> আমার কর্তব্য তো কেবল পথনির্দেশ করা। আমিই তো পরলোক ও ইহলোকের মালিক।

(সূরা লাইল: ১, ২, ১২, ১৩)

> ফলত দুঃখের সাথেই সুখ আছে।
>
> নিশ্চয়ই দুঃখের সাথেই আছে সুখ।

(সূরা ইনশিরাহ: ৫-৬)

> আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের আলো, তাঁর আলোর উপমা তাকে মধ্যে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে অবস্থিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র-সদৃশ, এটি প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র জয়তুন গাছের (তেল থেকে), যা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, (তাতে) অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে: আলোর ওপর আলো—আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর আলোর দিকে পথ নির্দেশ করেন।

(সূরা নূর: ৩৫)

সে চোখ বন্ধ ক’রে এসব পড়ছিল। এমন সময়ে সে একটা পাথুরে কিছু স’রে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। সে সাগ্রহে তাকিয়ে দেকল যে সে যাতে ব’সে আছে তা আসলে কোনো গর্ত নয়, একটা সুড়ঙ্গ পথ। **পথটা সোজা নয়, অথচ ওদিক তেকে তার মধ্য দিয়ে একটা আলো প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও সে এতদিন জেনে এসেছে যে আলো সরলরেখায় চলে।** সে সেই আলোয় পথ চলতে লাগল। সে সেই আলোর রহস্যময় চরিত্র দেখে বিস্মিত হলো। **সে যত পথ এগোচ্ছে, তত পেছনের দিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আলো থাকছে শুধু সামনে।** আলোটা তার সাথেই

চলছে ব'লে তার মনে হলো। সে ভাবল—সম্ভবত এ হলো হেদায়তের আলো। পথ দেখার আলো। এ আলো পেলে কেউ আর পেছনে যেতে পারে না। কারণ তার পেছনটা তওবার প্লাবনে বিলীন হয়ে গেছে। এ আলো সরলরেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, কারণ তা চ'লে গেছে পথ বরাবর। **অবশ্য এ আলো বাঁকা পথকেও সোজা ক'রে দেয়।** সে পড়তে লাগল:

আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার ***বুক খুলে দিয়েছেন,*** এবং সে তার প্রতিপালকের আলোর ওপরে আছে, (সে কি তার মতো যে এরূপ নয়?) দুর্ভোগ তাদের যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ। ওরা ***স্পষ্ট*** বিভ্রান্তিতে আছে। আল্লাহ্ উত্তম বাণী-সম্বলিত কেতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে: এটিই আল্লাহ্র পথ নির্দেশ—তিনি যাকে ইচ্ছা তার দ্বারা পথ দেখান। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

(সূরা যুমার: ২২-২৩)

সে নিজ মনে বলতে লাগল—'প্রভু গো! তোমার আলো বাঁকা পথকেও সোজা ক'রে দেয়।' এই কথাটা বলতে বলতেই সে এমন একটা জায়গায় এসে থেমে গেল যেখান থেকে সুড়ঙ্গটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকের পথটি কঠিন—এবড়ো খেবড়ো, বামদিকের পথটি সহজ। সে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল কোন পথে যাব। সহসা তার মনে পড়ল কোরআনে কারীমের আয়াত:

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে ক্লেশকর শ্রমনির্ভর ক'রে সৃষ্টি করেছি।....

এবং আমি কি তাকে দু'টি পথ দেখাইনি? কিন্তু সে তো গিরি সংকটে (কষ্টসাধ্য পথে) প্রবেশ করল না।

(সূরা বালাদ: ৪, ১০, ১১)

আল্লাহ্ কোনো মানুষের মধ্যে দুটি মন সৃষ্টি করেননি।

(৩৩:৩৪)

সে ভাবল, 'পথ দুটো অথচ মন একটা'—সুতরাং একটাকেই বেছে নিতে হবে। তাই সে *বিসমিল্লাহ* ব'লে ডানদিকের কঠিন পথটি বেছে নিল। আর অমনি কে যেন কোথায় ব'লে উঠল—মারহাবা!

সে এই পথে বেশি দ্রুত এগোতে পারছিল না। তার সারা শরীর ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে গেছে। পায়ের গোড়ালি ও আঙ্গুল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। নিঃশ্বাসে ক্লান্তি এসে গেছে। এমন সময়ে হঠাৎ ক'রে তার পথপ্রদর্শক আলোটি উধাও হয়ে গেল। সে গভীর ঘুটঘুটে ভূতুরে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। সে অন্ধকার এত বেশি গাঢ় এবং ভারী যে সে যেন তার ত্বকের ওপর কালো একটি চাদরের স্তর অনুভব করতে লাগল। সে আর নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে না। সে অত্যন্ত অবাক হলো। ভাবল—অন্ধকারেরও যে এত ওজন, এত গাম্ভীর্য, তা তো আগে কখনও বুঝিনি। কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে ব'সে তেকে আবারও অনুভবে পথ চলতে শুরু করল। কিন্তু এভাবে পথ চলতে হলে কখন সে পৌছাবে গন্তব্যে?

হঠাৎ তার মনে হলো—আমার গন্তব্য কী? কোথায় যাচ্ছি আমি? আমার লক্ষ্য কি সুড়ঙ্গ পার হওয়া নাকি একে জয় করা? সে প্রথম দিকে কিছুই স্মরণ করতে পারছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পরল যে তাকে গুরুজীই এখানে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি কেন পাঠিয়েছেন তা তার জানার কোনো দরকার নেই।

হঠাৎ সে পায়ের তলায় অল্প পানি অনুভব করল। ভিজে মাটি। টুকরো পাথর। শরীরে ফুটে যেতে পারে এমন সব টুকরো জিনিস। তার পা ফেলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। এদিকে সামনে যে বেশি পানি রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল কিছু যেন তাতে নড়ছিল সেই শব্দ দ্বারা। তার গা ছম ছম ক'রে উঠল। সে ছোটবেলা থেকে অন্ধকারের মধ্যে পানিকে খুব ভয় করে। কিন্তু তার মনে যত ভয় আসতে লাগল ততই সে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে লাগল। সহসা কোত্থেকে আওয়াজ এল—'সামনে সাপ!'

সে বলল—'গিলে খাব।'

'পোকা-মাকড়।'

'কবর দেব।'

'হঠাৎ পানি। অথই গভীর।'

'শুকিয়ে ফেলব। অনেক তৃষ্ণা।'

‘সামনে মৃত্যু।’

‘পেছনেও।’

‘চারপাশেই!’

বুড্ডা হঠাৎ থেমে গেল। সে যেন হঠাৎ হুঁশ ফিরে পেল। সে বুঝতে পারল যে সে এতক্ষণ যা বলেছে তা আবেগের উচ্ছাসে বলেছে। এখন সে স্বাভাবিক। **স্বাভাবিক মানুষ মৃত্যুকে বড় বেশি ভয় পায়।** সে খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ল। **তার চিন্তা যেন কোনো একটি বিন্দুতে এসে থেমে গেছে। তা না পারছে এগোতে, না পারছে পিছাতে। হায় সুড়ঙ্গ! সুড়ঙ্গের চলা কেবল সামনের দিকেই সম্ভব। পেছোবার উপায় নেই। কিন্তু সামনেও যদি এগোনো না যায়, তাহলে তাকে কি সুড়ঙ্গ বলা যায়? সে যেই একথা ভাবল,** অমনি অদৃশ্য থেকে শব্দ ভেসে এল—‘তাকে বলা যায় কবর।’

বুড্ডা ধপাস ক’রে কাদা পানির মধ্যে ব’সে পড়ল। তার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে। বেশী ভয় পেলে শরীরে কাঁপার শক্তিও থাকে না। কাঁপতে পারলেও কিছুটা শক্তি সৃষ্টি হয়। যেমন প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমরা কাঁপতে কাঁপতেই শরীরে তাপ সৃষ্টি করি।

অদৃশ্য থেকে বাণী এল—‘এগিয়ে যাও।’

আওয়াজটা যেন সুড়ঙ্গ ফাটিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। এই ধ্বনির কম্পনে সে যেমন ভয় পেল, তেমনি তা থেকে কিছু শক্তিও পেল। সে উঠে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারল আল্লাহএক ভয় পাবার উপকারিতা কী। তার চিন্তার জট এখন কিছুটা খুলেছে—তবে পেছনের দিকে, সামনের দিকে নয়। সে শুধু পেছনের কথা চিন্তা করতে পারল, সামনের চিন্তাটা যেন পানির ওপরে তেল—মাথায় আসতে চায় না।

‘এগিয়ে যাও!’

সে এক পা পিছালো।

‘এগিয়ে যাও। নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া তোমার দ্বিধা কটবে না।’

সে আরেক পা পিছালো।

**'মৃত্যু সকল সন্দেহের অতীত। মনের ব্যাধির জন্য একমাত্র ওষুধ।'**

সে আবারও প'ড়ে গেল।

বাণী এল—**'তুমি কঠিনকে এত সহজভাবে নিচ্ছ কেন?'**

একথায় বুড্ডার মনে প্রাণ-সঞ্চার হলো। সে তার ভুলটা বুঝতে পারল। সে বুঝতে পারল যে **মৃত্যু কোনো সহজ বিষয় নয়। সুতরাং তাকে সহজভাবে নেয়ারও দরকারও নেই। কঠিনকে কঠিনভাবে নিলেই তা সামাল দেয়া সম্ভব**। এই পথটা যদি কঠিন না হতো, তাহলে সে এত সফলভাবে তাতে এগোতে পারত না। **কাঠিন্যই তার যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে**। তার মনে পড়ল তার ছোটবেলার একটি ঘটনা। সে একদিন তার বাবার সাথে বর্ষাকালে গ্রামের হাট থেকে বাজার ক'রে ফিরছিল। সে হাঁটু-প্রমাণ কাদায় পথ চলতে পারছিল না। তার বেহাল অবস্থা দেখে তার বাবা তাকে কাছে ডেকে তাঁর মাথার বোঝাটাকে ছেলের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বললেন—'এবার হাঁট, আর প'ড়ে যাবার ভয় নেই।' সে সত্যি-সত্যি আর পড়ল না। পরে তার বাবা তাকে বুঝিয়েছিলেন যে, **মানুষ যখন দায়িত্ব পায় তখন তার যোগ্যতাও বেড়ে যায়**। তার মনে পড়ল নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জন স্টেইনবেকের *The Flight* গল্পের সেই বাণীটি: A boy gets to be a man when a man is needed. যখন পুরুষের দরকার পড়ে, তখন একটা বালকও পুরুষের মতো আচরণ করে। সুতরাং সে আবারও সামনে এগোতে শুরু করল। কিন্তু আবারও হুশিয়ারি—'মৃত্যু!'

সে শিশুর মতো টলতে টলতে আরেক পা এগোল। আবারও শুনতে পেল—'এখানে সামান্য ব্যবধানেই রয়েছে মৃত্যু। আরেক বার ভেবে দেখ।'

সে একটা বইতে পড়েছিল যে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কাজের প্রেরণা এবং যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একটা তত্ত্ব আছে যাকে বলে Goal Setting Theory of Motivation বা প্রেরণার (প্রেষণার) লক্ষ্য-নির্ধারণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি অনুসারে, কর্মীরা কাজের যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে ব'লে মনে করা হয়, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিৎ তার চেয়ে একটু উঁচুতে। তাতে কর্মীদের উদ্যম ও প্রেরণা বাড়বে,

যোগ্যতাও বাড়বে। একথা কোরআনেও আছে—আল্লাহ্ মানুষকে কঠিন ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চালিত করেন তার যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য (দ্রঃ *ধ্যানের শক্তি ও নবজীবন)*, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা পছন্দ না ক'রে জীবনটাকে সহজে পেতে চায়। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে **জীবনটাকে পাওয়া ব'লে কিছু নেই, তাকে গ'ড়ে নিতে হয়**। তার আরো মনে পড়ল যে সূরা লাইল-এ আল্লাহ্ বলেছেন যে যারা ভালো কাজ করতে চায় এবং করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য ভালোকাজ করাকে সহজ ক'রে দেবেন। অর্থাৎ তার ভালোকাজের যোগ্যতা বাড়তে থাকবে।

সে দাঁড়িয়ে গেল। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এখানে কি শুধু মৃত্যু আছে? আল্লাহ্ কি নেই এখানে?'

কোনো সাড়া এলো না।

সে আবারও প্রশ্ন করল—'এখানে কি আল্লাহ্ নেই?'

নীরবতা।

খানিক পর গুরুজীর কণ্ঠ ভেসে এল—'চিন্তা কম ক'রে কথা বলবে।'

সে বুঝতে পারল গুরুজী তার দিকে নজর রাখছেন। তৎক্ষণাৎ তার মুখ থেকে শক্তিধারার মতো বাণী বের হয়ে এল:

শপথ গনগনে আগুনের

যখন তা আলোর সান্নিধ্যে ঘটায়

তীব্র তাপের সমারোহ

এবং ক্ষুধার, যখন তা আত্মমুখী হয়ে

নিজেকে পোড়ায়

এবং সূর্যের, যখন তা অনায়াসে গিলে খায়

উপস্থিত গোলার্ধের সবটুকু রাত:

আমার প্রতিপালক তাঁর অনুপস্থিতির মধ্যেও বর্তমান

তাঁর অনুপস্থিতিও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য

এবং শপথ তাঁর আমি যাঁকে পাইনি

তিনি তাঁর গোলামের না-পাওয়ার মধ্যেও বিদ্যমান

পূর্ণগর্ভা জননীর শপথ,

যার প্রসব-বেদনার মধ্যেই রয়েছে কাঙ্খিত সন্তানের প্রতিশ্রুতি

এবং জঠরস্থ সন্তানের—

যার জন্মের প্রথম শর্ত প্রসব বেদনাঃ

প্রতিটি দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই আল্লাহ্ আছেন

তিনি আছেন তাঁর পথ চলার মুহুর্মুহ রক্তপাতের

মধ্যেও এবং শপথ নিঃশ্বাসের, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে

আগামী প্রশ্বাস

আল্লাহ্ রয়েছেন তাঁর অনুপস্থিতির মধ্যেও

পুরোপুরি অভিন্ন মাত্রায়

প্রশংসা তাঁর, থাকা-না-থাকা উভয়ই যাঁর অস্তিত্বেও

এপিঠ-ওপিঠ।

তার উচ্চারণ শেষ হতে না হতেই গোটা সুড়ঙ্গ আলোকিত হয়ে উঠল। সে সবানে তাকিয়ে দেখল যে তার সুড়ঙ্গ এখানেই শেষ। সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের গর্ত—ঘুঁটঘুঁটে কালো শূন্যতার মধ্যে একটি গর্ত। তার দিকে তাকালে মনে হয় যেন দৃষ্টি হারিয়ে গেল, চিন্তা স্তব্ধ হয়ে এল, চারদিক থেকে গ্রাস করল এক ভয়াল একাকিত্ব। তার বিশালতা এত যে তা যেন গোটা মহাবিশ্বকে গিলে খেতে পারে। তার মধ্যে তীব্র অন্ধকার যেন গাঢ় ধোঁয়ার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই অন্ধাকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে এক ভূতুড়ে আকর্ষণী শক্তি, নিঃস্বতার আর্তচিৎকার, বীভৎস দৃশ্যাবলী, এবং ক্ষুধার্তের মতো তারা

এগিয়ে এসে আবারও সেই অসীম গহবরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হতে লাগল যে সে যদি আর এক পা এগোয় তাহলে অন্ধকারের সুড়ঙ্গটি তাকে তীব্র আকর্ষণে টেনে নিয়ে যাবে—তাকে টানতে থাকবে অনন্তকাল ধ'রে এবং সে সেই গভীর গর্তের মধ্যে প'ড়ে যাবে—এবং অসহায়ভাবে শুধু পড়তেই থাকবে। সে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। সে দেখতে পেল যে গর্তটির গভীরে লেখা আছে একটি শব্দ—**মৃত্যু!** এই লেখাটি থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রূপ এবং উদ্ভট আকৃতি। বুড্ডা বুঝতে পারল সে কিসের সামনে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তার চিন্তা অনুভূতি সব অতীতমুখী হয়ে ছুটতে লাগল। সে তার জীবনের সমুদয় পাপকে সামনে দেখতে পেল। চোখ দুটি বন্ধ করার কোনো উপায় তার ছিল না। সেগুলি যেন আপনা থেকেই বড় হয়ে আসতে লাগল। এখন আর চোখ তার কথামতো চলছে না, তার সাহায্যেরও এখন দরকার চোখের নেই; তারা যেন নিজেরাই দৃশ্যসচেতন। বুড্ডা জড়িতশ্বাসে তওবা পড়ে নিল। তারপর কালিমা তায়্যিবা, তারপর কালিমা শাহাদাত। অন্ধকূপ থেকে হঠাৎ এক ঝলক শীতল হাওয়া তার দিকে শ্বাস ফেলল। তার শরীর অকেজো হয়ে আসতে লাগল। হৃদকম্প ধীর হতে লাগল। নিঃশ্বাসে এখন শক্তি লাগছে বেশি—ফুসফুস যেন তার নিজের দখলে নেই। সে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বলল—মাত্র পাঁচ মিনিট! প্লিজ! একটা প্রার্থনা করা দরকার।

কিন্তু আরো শীতল এবং গাঢ় ঘুটঘুটে একটা জিহ্বা তার দিকে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে এল। সে আপ্রাণ মিনতিতে বলল—এক মিনিট তাহলে। এখনও মনটাকে গোছগাছ ক'রে নিতে পারিনি।

জিহবাটা তার নিঃশ্বাস ধ'রে টানতে শুরু করল। সে কোনো মতে 'এক সেকেন্ড!!' ব'লে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পাঁচ

## মৃত্যু এবং কোরবানি

গুরুজী বললেন—'চোখ খোল!'

বুড্ডা চোখ খুলেই চিৎকার ক'রে উঠল—'আহ্ মৃত্যু! মৃত্যু চাই!'

সে তাকিয়ে দেখল যে সে গুরুজীর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ল, কিভাবে এখানে এল, তা তার মনে পড়ছে না, এমনকি মৃত্যুর বীভৎস চেহারার কথাও তার মনে তেমন দাগ কাটেনি—তার শুধু মনে পড়ছে এমন একটি আলোর কতা যাতে তার সত্তা ডুবে গেছে। সে মোহাবিষ্টের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আরজ করল—'গুরুজী, আপনার কাছে আসতে চাই।'

গুরুজী বললেন—'চেষ্টা কর।'

সে গুরুজীর সামনে গিয়ে বসল। গুরুজী বললেন—'কী দেখেছিলে? '

'আহ! গুরুজী, আমার ভাষা ব্যর্থ। কী বলতে পারি আমি। আমি যার জন্য পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে চার টাকা দান করি আর এক টাকার রুটি কিনে খাই, যার জন্য পথ চলার সময়ে হাঁটি না—দৌড়াই, যার জন্য আকাশ ছুঁয়ে যাওয়া একটা পাখির পিছু নিতে গিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এঁদোডোবার মধ্যে প'ড়ে যাই এবং পরে পা না-ভাঙার কারণে আল্লাহকে ধন্যবাদ দেই, যা চাই বলে সাগরবেলার বালির ওপরে নিজের নাম লিখে ঢেউকে তার উপরে লেলিয়ে বলি—নিশ্চিহ্ন কর এই নাম, যার সন্ধানে মত্ত হয়ে বাসন্তী বাতাস গায়ে লাগলে কাক থেকে কোকিলকে আলাদা ক'রে চিনতে পারি, যার সন্ধানে পালন করেছি কঠিন ব্রত—এক নাগাড়ে সাত দিন পর্যন্ত গাল দিয়ে নিঃশ্বাস নেইনি, যা পাবার জন্য আহার করার আগে পানি পান করাকে ফরজ হিসেবে নিয়েছি, চোখ খোলা রেখে ঘুমাই, কাজ বন্ধ ক'রে হাঁটি, নিজের ছায়া থেকে পালাবার জন্য হাঁটার বদলে দৌড়াই, নিশাচর পাখির মতো ঝোপঝাড় বিলখালের মধ্যে ঘুরঘুর করি, নিন্দুকের গালে মিষ্টি পুরে দেই এবং প্রশংসাকারীর হাতে দেই চটি, যাকে পাবার জন্য মাথার ওপরে বালিশ রেখে বসি, ইটের ওপর মাথা রেখে শুই—দেখলাম......দেখলাম তা তো লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুরই মধ্যে। মুক্তি! আহ মুক্তি! সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মুক্তি যে রয়েছে মৃত্যুরই মধ্যে।'

‘দেখ বুড্ডা, তুমি যা চাচ্ছ, তা অতি মূল্যবান। সবচেয়ে মূল্যবান। আর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়? সবচেয়ে নিরাপদ এবং ভয়ংকর জায়গায়, তাই না?’

‘তাহলে কি মৃত্যুর আগে মুক্তি নেই?’

‘তোমার এই ভুল ধারণাটাকেই ভাঙতে হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ, অধিকাংশ এবং অধিকাংশ সাধকই ব্যর্থ হয় যে কারণে, অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে যে কারণে, তুমিও সেই রোগে ভুগছ, যদিও তোমার ক্ষেত্রে ব্যাধিটা আদৌ জটিল নয়। বরং তুমি মাঝে-মাঝে ঠিক জায়গাটাতে গিয়ে হাজির হও, আবার মাঝে-মাঝে পার্থিব মায়ার জালে জড়িয়ে যাও—সে মায়া এমন সূক্ষ্ম যে তুমি নিজেই ধরতে পার না যে তুমি মায়ার পিছনে ছুটছ।’

‘কী সেই মায়, গুরুজী?’

‘তোমার মুক্তি কামনা।’

‘মুক্তি কামনা? মুক্তি কামনাই মায়া?’

‘হ্যা।’

‘বুঝতে পারলাম না, গুরুজী।’

‘তুমি মুক্তি চাও কেন? কারণ মানবজীবনের ওটাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু তুমি মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? তুমি মৃত্যুর আগেই কি মুক্তি চাও? মরতে চাও না? মৃত্যুকে এড়াতে চাও? কেন, কী দোষ করেছে মৃত্যু? সে তো তোমার আর তোমার বন্ধুর মধ্যে ঘটকালি ক’রে দেয় মাত্র। তার দোষ কী? তোমার বন্ধুই তো নিজেকে মৃত্যুর পর্দার আড়ালে লুকিয়েছেন। তুমি মৃত্যুর আগে বহুবার মুক্তি পাবে, বহু মৃত্যুকে অতিক্রম করবে, কিন্তু তোমার পূর্ণাঙ্গ মুক্তি এবং প্রভুর সাথে পূর্ণাঙ্গ মিলন ঘটবে কেবল দৈহিক মৃত্যুর সময়ে। তার আগে তুমি পূর্ণাঙ্গ মুক্তি কেন চাও? মুক্তি পাবার পরেও কিছুদিন বেঁচে থেকে জীবনটাকে ভোগ করবে ব’লে? এটা কি তাহলে নফ্‌সের কারসাজি নয়? শোন: সব কিছু মৃত্যুর আগে পাব এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করব বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব, এরূপ চিন্তা করা কোনো সৎ এবং অনুগত কৃতজ্ঞ সাধকের কাজ নয়। এই চিন্তা থেকেই মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে। এই চিন্তা যার আছে, তার সাধনায় সফলতা যত বেশি আসে, ততই সে বিভ্রান্ত হতে থাকে। ***প্রকৃত আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যুর প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে।*** কারণ তিনি পূর্ণাঙ্গতা

চান, অথচ পূর্ণাঙ্গতা লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর মধ্যে। তোমার সাধনা ইহকালে, কিন্তু লক্ষ্য থাকবে পরকাল।

আল্লাহ্ বিভিন্নভাবে বলেছেন—আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যুদান করি; আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে। তিনি জীবনদান করলে খুশি হও, তাহলে তিনি মৃত্যুদান করলে খুশি হও না কেন? তুমি তো স্বার্থপর। তিনি জীবন দান করলে তুমি খুশি হও, কারণ তখন তুমি নিজেকে পাও। অপরপক্ষে তিনি মৃত্যু দান করলে তুমি দুঃখিত হও, কারণ তখন তুমি নিজেকে হারাও। অথচ তুমি একথা বুঝলে না যে মৃত্যুর মাধ্যমে তুমি তাঁকেই পাও, যা তোমার জীবনের চেয়েও বড় পাওনা। কেন ভুলে যাও যে **তিনিই মৃত্যু, তিনিই জীবন?** সুতরাং দিন দিন ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর নেশা জাগানো চাই। এই নেশা যখন জাগবে, তখন তুমি পৃথিবীতে যাই কর না কেন, সবই হবে ইবাদত। একটা কথা মনে রেখ—**এখানে পরকাল বা বেহেস্ত নেই সত্য, তবে আল্লাহ্ আছেন। তিনি তো কোনো বিশেষ সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তাই তাঁকে এখানেও পাওয়া যায়। তাঁকে পেয়েও লক্ষ্য করা চাই পরকালের দিকে। তা না হলে নফ্‌স তোমাকে তোমার যোগ্যতার ফলকে পৃথিবীতে আদায় করার জন্য তাগাদা দেবে। কোনো কিছু চাওয়া মানেই নফ্‌সের কাজ। নফ্‌সের এই সাধ মিটানোর উপযুক্ত জায়গা হলো পরকাল। কারণ তখন কোনো চাওয়া-পাওয়ার খেসারত হিসেবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে না। বিশুদ্ধ সাধকের কাছে আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই চাওয়ার নেই। এবং এই চাওয়ার প্রকাশ ঘটে দেয়ার মাধ্যমে—তার লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য আমিত্বকে বিসর্জন দেয়ার প্রতি। এই দেয়াই হলো প্রকৃত চাওয়া। আল্লাহ্‌কে চাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো চাওয়া ব'লে কিছু নেই।** অবশ্য একটা পর্যায় যারা অতিক্রম করেন তাদেরকে আল্লাহ্‌ই বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেন।

তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে থাকতে হবে। নিজেকে হত্যা করতে হবে। তাহলে দেখবে যে তুমি প্রতি মুহূর্তে একটু একটু ক'রে জেগে উঠছ। একই সাথে তোমাকে কোরবানীও করতে হবে।

'গুরুজী, খুন আর কোরবানীর মধ্যে কী পার্থক্য একটু বলবেন?'

'ভালো খুন হলো খারাপ জিনিসকে হত্যা করা; অপরপক্ষে কোরবানী হলো ভালো জিনিসকে হত্যা করা।'

'সে আবার কেমন?'

'কুপ্রবৃত্তিকে দমন করাই তাকে খুন করা বা নফ্‌সকে খুন করা। এর নাম হলো বেঁচে থাকা। মন্দের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা। যা কিছু ভালো, তারও সীমাতিরিক্ত চর্চা বা বাড়াবাড়ি মন্দের দলভুক্ত। তাকে দমন করা বা নির্মূল করা হলো নিরাপদ থাকা। এটাই কোরবানীর শুরু। আর যা কিছু বৈধ এবং শখের এবং আদরের এবং পছন্দের, তাকে আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়া হলো কোরবানী। ইসমাইল (আঃ) ইব্রাহিম (আঃ) এর কলিজার টুকরো ছিলেন। সন্তানকে এভাবে ভালোবাসা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ দেখতে চাইলেন ইব্রাহিম (আঃ) তাঁকে খুশি করার জন্য নিজের বৈধ আদরের বস্তুকেও বিসর্জন দিতে রাজি আছেন কি-না। একেই বলে কোরবানি। খারাপ নফ্‌সকে দমন করার চেয়ে এর মূল্য আরো বেশি। কারণ এ সম্ভব পবিত্রতা অর্জনের পর, মন্দ থেকে দূরে থাকার সংকল্পে স্থির হওয়ার পর, আগে নয়। অনেকে কোরবানীকে শুধু নফ্‌স দমনের উপায় বলে মনে করে। কিন্তু আসলে সাধকের জন্য এ হলো আত্মশুদ্ধির উপায়, যা শুরু হয় নফ্‌স দমনের পরের ধাপে:

তোমরা কখনও পূণ্য অর্জন করবে না যতক্ষণ নিজেদের প্রিয়বস্তু থেকে ব্যয় না করবে।

(৩:৯২)

দেখেছ আল্লাহ্‌ কিভাবে তোমার প্রিয়বস্তুর ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করেন, অথচ তার পরও তুমি তাঁকে বঞ্চিত করতে চাও? আরেকটা আয়াত বিবেচনা কর:

আর ইহুদীদের জন্য আমি বহু পবিত্র বস্তু হারাম ক'রে দিয়েছি যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে।

(৪:১৬০)

তোমার ময়লা-ধরা, ছানি-পড়া চোখে এর রহস্য ধরা পড়বে কিভাবে? তুমি ভাবছ—এই আয়াতের সাথে আবার কোরবানীর কী সম্পর্ক? কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পবিত্র কোরআনের একটা আয়াতের বিভিন্ন মাত্রার অর্থ রয়েছে। অনেকে তো অহংকারভরে একথা অস্বীকারই করে। আবার আমি যখন অর্থ ব'লে দেই, অনেকে তখন নিজেকে ছোট মনে ক'রে ভাবে, অর্থটা আমি কেন বের করতে পারলাম না? সুতরাং তারা তা পরিত্যাগ করে। অথচ তারা ভেবে দেখে না যে আল্লাহ্‌ তাঁর জ্ঞান যাকে ইচ্ছা দান করেন। এতেও আমার কোনো হাত বা কৃতিত্ব নেই। কাফেরদের এক অংশ বলত—নবুয়তি কেন মুহম্মদকে দেয়া হলো? কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির ওপর কেন নাযিল হলো না? এসব হলো অহংকার। অবশ্য যারা আত্মসমর্পণকারী, তারা জ্ঞানীকে কখনও হিংসা করেন না, বরং হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। যাহোক, এই আয়াতে

আল্লাহ্ বলেছেন যে ইহুদীরা হালাল নিয়েই সীমালঙ্ঘন করেছিল, হারাম নিয়ে নয়, কারণ হারাম নিজেই হলো সীমালঙ্ঘন। তারা হালাল নিয়ে শুধু ভোগের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল, সংযম বা সীমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। **সংযম মানেই ভোগের মধ্যে সীমা এবং শুধু ভোগ নয়, ত্যাগও। অর্থাৎ ত্যাগের বা কোরবানীর সাথে যদি হালালকে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে তা আর হালাল থাকে না। কারণ তা হয় স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, লোভ এবং চরম অকৃতজ্ঞতার সামিল।**

আয়াতটার আরো কিছু অর্থ আমার জানা আছে যা এখানে প্রাসঙ্গিক না। আরেকটা উদাহরণ দেখ:

> ....আমি পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে, যখন তারা কসম করেছিল যে, অবশ্যই তারা ভোরবেলায় বাগানের ফল আহরণ করবে—আর তারা 'ইনশাল্লাহ্' বলেনি। অতঃপর আপনার রবের তরফ থেকে বাগানের ওপর এক বিপর্যয় আপতিত হলো, আর তারা ছিল তখন নিদ্রিত। ফলে বাগানটি শষ্য-কাটা ক্ষেতের মতো কালো রঙের হয়ে গেল, অতএব তারা সকালে একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল—'তোমরা ভোরবেলায় নিজ নিজ ক্ষেতের দিকে চল, যদি তোমরা ফল আহরণ করতে চাও।' অতঃপর তারা বলল, *'চুপি চুপি কথা বলতে বলতে: আজ যেন বাগানে কোনো মিসকিন তোমাদের কাছে প্রবেশ না করতে পারে।'* আর তারা মিসকিনদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম মনে ক'রে ভোরবেলা বাগানে যাত্রা করল। তারপর যখন তারা বাগানের অবস্থা দেখল তখন তারা বলল—'আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গেছি। বরং আমরা তো ভাগ্যবঞ্চিত।' তাদের ভালো লোকটি বলল—আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্র *পবিত্রতা-মহিমা* কেন ঘোষণা করছ না? তখনতারা বলল—আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো ছিলাম অত্যাচারী। অতঃপর তারা একে অপরকে সম্মোধন ক'রে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল—হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সবাই ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। *আশা করা যায় এর পরিবর্তে আমাদের রব আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্ট বাগান; আমরা তো আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।* শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর আখেরাতের শাস্তি তো অতি গুরুতর। কি ভালো হতো যদি তারা জানত (অর্থাৎ তাদের ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত!)
>
> (৬৮:১৭-৩৩)

দেখ, কি চমৎকার উদাহরণ! **ত্যাগ ছাড়া হালাল ভোগও হালাল নয়। কোরবানী ছাড়া ভোগ হালাল নয়।** তারা তাদের বৈধ বাগান ভোগ করতে চেয়েছিল, অবৈধ বাগান নয়। তারা শূকরের মাংশ খেতে চায়নি। তবুও তাদের ভোগকে আল্লাহ্ তাদের জন্য হালাল করেননি—তা তাদেরকে ভোগই করতে দেননি। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য কর—তারা আল্লাহ্র পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা ক'রে এবং তওবা ক'রে অর্থাৎ আল্লাহ্র 'অভিমুখী হয়ে' নতুন করে আশা করল। যা তারা কোরবানী করেনি, অর্থাৎ মিসকিনদেরকে যার ভাগ দেয়নি, তা হারাবার পরই তাদের মনে মহিমা-ঘোষণার ইচ্ছা জাগল। এই ইচ্ছাই আন্তরিক, কারণ তারা ঠেকে শিখেছে, ভুল থেকে শিখেছে। তাদের knowledge এর development ঘটেছে এবং তা wisdom-এ পরিণত হয়েছে। জ্ঞান বা knowledge যতক্ষণ অনুভূতির স্তরে ভারসাম্য সৃষ্টি ক'রে wisdom এ রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ তা জীবনের কোনো

গঠনমূলক কাজে লাগে না, তা দ্বারা আচরণকে ম্যানেজ করা যায় না। একেই Daniel Goleman বলেছেন Emotinal Intelligence। ভালোভাবে লক্ষ্য কর, ***কোরবানী*** এবং ***তওবা*** ছাড়া আল্লাহ্‌র ***পবিত্রতা-মহিমা*** ঘোষণা আন্তরিক হয় না, কবুলও হয় না। Knowledge দ্বারা emotion কে নিয়ন্ত্রণ করলে যে Intelligence সৃষ্টি হয়, তা হলো প্রকৃত কোরবানীর ফলশ্রুতি। বর্তমান যুগে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় latest পাঠ্যসূচিতে Emotional Intelligence সম্বন্ধে পড়ানো হয়। অথচ কেউ জানছে না যে তার আকর হলো কোরআন। যাহোক, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অমুসলিমরাই ইদানিং মুসলমানদের চেয়ে বেশি কোরবানীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে—তারা আর কিছু না হোক অন্তত ভালোবাসার সামাজিক রূপটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর মুসলমানেরা ঝুঁকে পড়েছে নফসের দিকে। অমুসলিমরা তার ফলও পাচ্ছে। সমৃদ্ধি এখন তাদেরই। আল্লাহ্ কি তাদেরকে তা না জেনেশুনে দিয়েছেন? তিনি বলেছেন:

.....আল্লাহ্ নিজ **দয়ায়** তাদেরকে ধনী ক'রে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, পরম **জ্ঞানী**।(২৪: ৩২)

এখানে তো আল্লাহ্ বলেই দিয়েছেন যে তিনি তাঁর **জ্ঞান** ব্যবহার ক'রেই তার **দয়ার** মাধ্যমে প্রাচুর্যকে বিতরণ করেন—অর্থাৎ ***তিনি জেনেশুনেই দিয়ে থাকেন,*** নয় কি? তাহলে তাদের ভালো কাজগুলোর ফল তো আল্লাহ্ দেবেনই। আরেকটা উদাহরণ দেখ:

যখন সন্ধ্যার সময়ে তার [সুলায়মান (আঃ)] কাছে উপস্থিত করা হলো **সুন্দর ঘোড়াগুলো, তখন সে বলল, আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে (অর্থাৎ নামাজ থেকে) গাফেল হয়ে** *সুন্দর জিনিসের* **প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে চ'লে গেছে; ওগুলোকে আমার সামনে আন। তারপর সে সেগুলোর পা ও গলা কেটে ফেলতে লাগল।**

**(৩৮:৩১-৩৩)**

কোরবানির এত সুন্দর উদাহরণ আর খুব বেশি নাই। সুলায়মান (আঃ) তো বলেননি যে তিনি অসুন্দর অশোভন কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তো রীতিমতো বৈধ সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য দর্শন করার অবকাশে আসরের নামাজের সময় চ'লে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে যে-সুন্দর আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে তাঁকে দূরে রেখেছে তা কোরবানী করা আবশ্যক। ফলত তিনি নিজের আশা-আকাঙ্খাকে কোরবানী করার জন্য ঘোড়াগুলোকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললেন। আধুনিক যুগের **পশু-অধিকার** (Animal Rights) বিশেষজ্ঞগণ ঘটনাটায় মনঃক্ষুণ্ন হলেও তা ছিল এক চমৎকার ত্যাগের উদাহরণ। **এই ত্যাগ অসুন্দরকে ত্যাগ নয়, এ হলো সুন্দরকে ত্যাগ**। অসুন্দরকে ত্যাগ করা মানে হারাম বর্জন করা, কিন্তু

**ক্ষণস্থায়ী সুন্দরকে** ত্যাগ করা মানে হলো কোরবানী। কেউ না জানুক, অন্তত সাধকের একথা জানতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন—আমার কাছে কোরবানীর মাংস পৌঁছায় না, পৌঁছায় তোমাদের খোদাভীতি বা হৃদয়। কিন্তু তোমাদের হৃদয় তো আটকে আছে বস্তুর মধ্যে। ফলে সেই বস্তু ত্যাগ না করা পর্যন্ত হৃদয়কে তা থেকে মুক্তও করা যাবে না এবং আল্লাহকেও তা দেয়া যাবে না। সুতরাং মনে রাখবে **মন্দ কাজ থেকে নফ্‌সকে দমন করা হলো পাপ বর্জন করা, আর অর্জিত বৈধ যোগ্যতাকে ইহকালে ভোগ না ক'রে তা পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখা হলো প্রকৃত কোরবানী এবং সঞ্চয়।** তুমি যদি তোমার সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গতাকে মৃত্যুর সময়ে অর্জন করবে ব'লে নিয়ত কর এবং সেভাবে এগিয়ে যেতে থাক, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে যে পৃথিবীর সব মায়া এবং স্বপ্ন—এবং তখন তোমার শ্রেষ্ঠ কোরবানী প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'গুরুজী, আল্লাহ্ আপনার ওপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন। এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা আসলে আগে জানতাম না।'

'আল্লাহ্ তোমাকে জ্ঞান দান করুন।'

'আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করুন।'

'যে গুরুর আদেশে এখানে এসেছ তাঁর সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?'

'তাঁকে খুব বেশি কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে উনি যে-বাতিটা জ্বেলে রাতে বই পড়েন, তার গোড়ায় কোনো অন্ধকার দেখলাম না।'

'আল্লাহ্ তোমাকে আরো সুন্দর অর্ন্তদৃষ্টি এবং ভাষা-যোগ্যতা দান করুন। আর কী দেখলে?'

'দেখলাম উনি একা থাকেন কিন্তু নামায পড়েন জামায়াতে।'

'আর?'

'আর, রান্না করার কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, কিন্তু খাওয়াতে অনভিজ্ঞ।'

'তুমি এখন যেতে পার।'

'গুরুজী, যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাই।'

'অনুমতি দেয়া হলো।'

'মৃত্যু আমাকে গ্রহণ করেনি কেন?'

‘কারণ তুমি এখনও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির জন্য উপযুক্ত হওনি।’

‘তাহলে কি আমার যোগ্যতা পূর্ণাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে না?’

‘তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমার যোগ্যতা পূর্ণাঙ্গ হবে না।’

ছয়

## গতিহীন অগ্রগতি

বুড্ডা প্রথম গুরুর কাছে ফিরে গেল। গুরুজী তখন সবজি বাগানে কাজ করছিলেন। বুড্ডা সরাসরি বাগানে ঢুকে তাকে সালাম জানিয়ে বলল—'গুরুজী, বাগানে পানি দেব?'

গুরুজী তার দিকে না তাকিয়ে কাজ করতে করতেই বললেন—'দুদিন পর তোমাকে যেন এখানে না দেখি।'

'আমি জানি আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনি আমাকে দেখতে পাবেন'—বলল বুড্ডা, 'কাজেই আপনার চোখকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করব না।'

'তার মানে এখানে লুকিয়েও থাকার চেষ্টা করবে না?'

'আমি জানতাম আপনি আমাকে তাড়াবেন না।'

'পানি দাও।'

বুড্ডা অত্যন্ত আহলাদের সাথে গাছে দিতে লাগল। পানি দেয়া শেষে সে গুরুজীকে জানাল—'একটা ফুলও ফোটেনি।'

গুরুজী বললেন—'ঝরেওনি।'

বুড্ডা আশ্বস্ত হলো। গুরুজী বললেন—'খুশী হওয়ার কিছু নেই। জোর ক'রে দুঃখ পাবারও দরকার নেই।'

'গুরুজী, তবুও যেন তাকিয়ে থাকতে মন চায়। ফোটা এবং ঝ'রে যাওয়ার মাঝামাঝিও দেখার মতো অনেক কিছু রয়ে গেছে।'

'চোখকে বিশ্বাস কর না।'

'কানকেও না?'

'একটা ফুল দেকতে কয়টা চোখ লাগে?'

'উভয় চোখের একই কাজ। তবুও একটা ছাড়া অন্যটাকে কানা বলা হয়।'

‘যার একটাও নেই সে অন্ধ। অথচ দুটো থাকলেও কাজ চলত একটারই। একই সাথে দুচোখ দিয়ে দুটো জিনিস দেখা যায় না।’

‘এদিক দিয়ে কানই ভালো।’

‘কান যদি দেখতে পেত আর চোখ শুনতে পেত, তাহলে সব মানুষ অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকত। শোনার যন্ত্রকে এদিক-ওদিক ইচ্ছেমতো ঘোরানো গেলে মানুষের উন্নতি ঘটত বড়জোর বাদুড়ের যোগ্যতা পর্যন্ত এবং দেখার যন্ত্রকে ইচ্ছে মতো ঘোরানো না গেলে মানুষের পায়ের নিচে রোবটের চাকা থাকতে হতো।’

‘গুরুজী, আপনি সত্যকে মিথ্যার মতো আকর্ষণীয় ক’রে বলেছেন।’

‘যা ফুটবে তা তুমি দেখনি আর যা ঝ’রে যাবে তুমি তার কান্না শোনোনি।’

‘আল্লাহ্ অন্ধকে আলো দান করুন আর বধিরকে সন্দেহমুক্ত রাখুন।’

‘ফুটে ওঠার সামনে রয়েছে এক অজানা ভবিষ্যৎ আর ঝ’রে যাবার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ স্মৃতি। যা ঝরেছে তা যেন না ফোটে। যা ফুটেছে তাতে পানি দাও। যা ফুটবে তার দায়িত্ব তোমার নয়।’

সাত

## মৃত্যুর ফর্মুলা

গুরুজী যখন নিজের আসনে চুপচাপ ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন বুড্ডা গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসল। সে কী যেন বলতে চেয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি ভুলে গেল। গুরুজীর কাছে বসতেই তার মন যেন প্রশ্নহীন হয়ে গেল। তার অনুভূতি স্তব্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের গভীরে কোথাও যেন ছড়িয়ে গেল একরাশ শীতলতা। তবুও গুরুজীর কাছে বিজ্ঞের মতো মৌনি হয়ে ব'সে থাকা শোভনীয় হবে কিনা সে ব্যাপারে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ফলে সে মন্তব্য ক'রে উঠল—'গুরুজী, আপনাকে আমার কেন যেন কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে না।'

'ভাষাহীন বাক্যই বেশি কথা বলে'—জবাব দিলেন গুরুজী।

'কিন্তু ভাষাহীন প্রশ্ন পাব কোথায়?'

'যা নেই তা খুঁজছ কেন?'

'কী নেই, গুরুজী?'

'*কী* শব্দটাই নেই।'

গুরুজীর এই কথাটা শোনার সাথে সাথে বুড্ডা এক মহানীরবতার মহাসমুদ্রে ডুবে গেল। সে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল যে সে যেন এক মহানিদ্রা থেকে জেগে উঠছে চেতনার এক শ্বাশ্বত স্রোতধারায়। সেখানে ভাষা নেই, চিন্তা নেই, প্রশ্ন নেই, কোনো জবাবের প্রয়োজনীয়তা নেই, কোনো পরোক্ষতা নেই, কোনো ওজন নেই, কোনো বন্ধন নেই, হতাশা নেই, ভয় নেই, ব্যস্ততা নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। সেখানে আছে কেবল সীমাহীনভাবে প্রলম্বিত বর্তমান। সে হাসি থামাতে পারল না। তীব্র আনন্দ এবং বিস্ময়ে হেসে উঠল। এ হাসি যেন ভেতর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ঠেলে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ের মধ্যে একটা তীব্র আনন্দ অনুভব করল। এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে সে নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছিল না ব'লে কিছুটা ভয়ও পাচ্ছিল—বিস্ময় ও অনস্তিত্বের ভয়। হারিয়ে যাওয়ার ভয়। তাই সে হাসতে হাসতেই ব'লে উঠল—'আমি কি ম'রে যাচ্ছি, গুরুজী? মনে হচ্ছে মরার সময়ে হাসছি। অথচ আমি লাফিং গ্রাস খাইনি।'

গুরুজী বললেন—'হাসির মুহূর্তে মরার কথা বলছ কেন? মৃত্যু এখন তোমাকে ছোঁবে না।'

গুরুজীর কথাটা শোনামাত্র তার মনে হলো সে যেন এক দিগন্তহীন সাদা ধবধবে আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেল। সে অনুভব করল যে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রয়েছে মাত্র একটাই পিঠ, অর্থাৎ এপিঠ—ওপিঠ ব'লে কিছু নেই। সবই প্রত্যক্ষতা, পরোক্ষতা ব'লে কিছুই নেই। তার সারা স্নায়ুতন্ত্রে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে এমন এক আনন্দের ঝড় বয়ে গেল যে তার মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত অতীতের স্মৃতিটুকু উধাও হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল যে মৃত্যু ব'লে এখানে কিছুই নেই। তবুও যেন কিছু একটা বাকি আছে। সে বুঝতে পারল যে এটাই মুক্তি। একই সঙ্গে সে এও বুঝতে পারল যে পূর্ণাঙ্গ মুক্তি এ নয়। তা যদি হতো তাহলে 'মুক্তি' শব্দটাই তার মনে আসত না। সে জানতে চাইল—'আমি এখন কোথায়, গুরুজী?'

'কাছাকাছি।'

'কার কাছাকাছি?'

'উচ্চারণে ভুল আছে।'

'কোথায় যেন একটু আটকে আছে।'

'ছাড়াবার চেষ্টাই তোমাকে বেশি ক'রে আটকাবে। মানুষ আটকে আছে তার বৃথা প্রচেষ্টা এবং ব্যস্ততার মধ্যে।'

'তবুও কিছুটা চিন্তা করতে হচ্ছে।'

'মানুষ তার নিজের চিন্তার জালে আটকে আছে। সে মনে করে যে সে চিন্তার মাধ্যমে তার যোগ্যতাকে কাজে খাটাচ্ছে। মুক্তচিন্তা করছে। কিন্তু আসলে সে যখন চিন্তাহীন হবার চেষ্টা করে তখনই বুঝতে পারে যে সে চিন্তা করে বাধ্য হয়। সে তার চিন্তা এবং চিন্তাপ্রক্রিয়ার হাতে বন্দী। সে ইচ্ছা করলেই চিন্তামুক্ত হতে পারে না। তা যদি পারত, তাহলে নামায এবং ধ্যানে তাকে এত চিন্তার মাছি তাড়াতে হতো না। এই চিন্তা থেকে উঠে আসে প্রশ্ন। সে প্রশ্নের পেছনে গাধার মতো ছোটে। গাধা জানে না যে তার সমানে যে মুলোটা ঝুলছে তা একটা প্রশ্নমাত্র। তারই অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ছুড়ে মারা এক ধূর্তামিপূর্ণ প্রশ্ন। *প্রশ্নের অস্তিত্বকে সে কখনও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় না ব'লে তার প্রশ্ন চিরতরে রয়েই যায়।* সামান্য একটা মুলো তাকে বহুদূর নিয়ে যায়। তুমি চিন্তা করছ বাধ্য হয়ে। কারণ ইচ্ছে করলেই তুমি

তোমার চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিতে পার না। **সে নিজের ইচ্ছায় চিন্তামুক্ত থাকতে পারে, কেবল সেই-ই পারে মুক্ত চিন্তা করতে।** নামাজে ও ধ্যানে তো তুমি নিজের চিন্তার হাতেই বন্দী থাক। মাথার মধ্যে চিন্তা থাকলে প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন থাকলে আত্মসমর্পণ নিঃশর্ত হবে না। আত্মসমর্পণ না হলে মুক্তি মিলবে না।'

'এখন কী করে?'

'কোনো কসাইখানা গিয়ে মাথাটা কাটিয়ে এস। মাথা দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না যাঁকে তুমি চাচ্ছ। তাঁকে পেতে হয় হৃদয় দিয়ে।'

বুড্ডার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। —'ভেঙ্গে গেছে, গুরুজী।'

'তুমিই ভেঙ্গে গেছ।'

'জ্বী।'

'আমার কাছে কেন এসেছিলে?'

'মাথাব্যাথা ছিল প্রচণ্ড।'

'জ্ঞানার্জনে তা দূর হবে না। মাথা কাটাও।'

'আল্লাহ্ আপনাকে ধারালো অস্ত্র দিয়েছেন।'

'এবং রক্তপাত আমার খুব পছন্দ।'

'আলহামদুলিল্লাহ্‌।'

'কিভাবে মাথা কাটতে হয় জান?'

'সিজদা দিয়ে।'

'ঠিক বলেছ। সিজদা মানে কী?'

'মাথার দাবী ত্যাগ করা।'

'তা কি মাথা দিয়ে সম্ভব?'

'বুঝলাম না।'

'মাথা দিয়ে কি মাথার দাবি ত্যাগ করা সম্ভব? কেউ মাথার দাবি কখন ত্যাগ করে?'

‘যখন তার মাথাকে নিরাপদ করতে চায়।’

‘দ্যাট্স্ রাইট। সিজদা মানে কী?’

‘গুরুজী, আপনি এক প্রশ্ন দুইবার করেছেন।’

‘কিন্তু এক জবাব দুইবার দেয়া চলবে না।’

‘প্রেম।’

‘ইগ্জ্যাক্ট্লি! কেউ যখন প্রেম করে সে প্রশ্ন তোলে না। প্রেম হলো নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু তুমি যা করছ তাকে কি প্রেম বলা যায়?’

‘পুরোপুরি না।’

‘চোপ! প্রেম কখনও আংশিক হয় না।’

‘আল্লাহ্ আপনার দয়া বাড়িয়ে দেন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।’

‘প্রেম মানে কী?’

‘মিলন।’

‘ঠিক। কেউ যখন কাউকে প্রেম করে, তখন সে তার সাথে মিলিত হতে চায়। সে তার বিলাভেড-এর হৃদয় এবং বৈশিষ্ট্য বা পরিপূরক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ফলত তারা দুটো দেহে একই হৃদয় বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ঐক্যের ধর্ম হলো সমস্ত বিভেদকে চুরমার ক'রে ভেতরের ঐক্যের সাথে বাইরের ঐক্যকেও মেলানো। ফলে মিলন ঘটে দেহের। এ হরো নারী পুরুষের প্রেম। আল্লাহকে প্রেম করা মানে হলো তাঁর যে-কোনো বিধানে সন্তুষ্ট থাকা। কোনো প্রশ্ন না তুলে তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর ইচ্ছার পুতুল হয়ে যাওয়া। সিজদার মাধ্যমে সিজদাকারী আল্লাহ্র নিকটস্থ হতে থাকে:

[হে মুহাম্মদ (সঃ)!] তুমি সিজদা কর ও আমার কাছাকাছি এস।

(সূরা ‘আলাক্: ১৯)

সিজদায় প্রশ্ন গুঁড়িয়ে যায়। প্রশ্নই দূরত্ব। তোমার প্রিয়তম রয়েছেন তোমার প্রশ্নের দূরত্বে।’

‘এখন তাহলে কী করা, গুরুজী?’

‘মরতে হবে।’

'মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়েছিলাম।'

**'মৃত্যু কোনো দূরের বস্তু নয় যে তুমি তার কাছাকাছি যাবে।'**

'তাহলে আমি কোথায় গিয়েছিলাম?'

'তুমি অতীত কালের কথা বলছ কেন?'

'মৃত্যুর সাথে ব্যাকরণের কী সম্পর্ক, গুরুজী?'

'অতীত-ভবিষ্যৎ দুটোই মৃত্যু। তোমাকে তা অতিক্রম ক'রে চিরবর্তমানের ঠিক এই মুহূর্তটিতে ঢুকে পড়তে হবে।'

'তাহলে কী মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারব?'

'তুমি যে-মৃত্যুর গহবরে আছ তা থেকে বের হয়ে আসতে পারব। তোমার আমিত্ব যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ তুমি জানতে পারছ না জীবন মানে কী।'

'একটু বুঝিয়ে বলবেন কি, গুরুজী?'

'এই বিষয়টাকে বুঝতে হলে মাথা খাটানো দরকার। মাথা খাটানো মানে হলো মাথার কাজ সঠিকভাবে ক'রে প্রাপ্ত তথ্যকে হৃদয়ের হাতে তুলে দেয়া। **মৃত্যু কী—এটা জানতে হবে মস্তিষ্ক দিয়ে। আর তারপর মৃত্যুবরণ করতে হবে মস্তিষ্ক অবনত ক'রে।** তাহলে তোমাকে এমন কিছু কথা বলি যা জানেন পৃথিবীর হাতে-গোনা কয়েকজন ব্যক্তি। সিজদা মানে কী?'

'গুরুজী এই নিয়ে তিনবার হলো।'

'চূড়ান্ত অর্থ।'

'গুরুজী, হাতে-গোনা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমি একজন নই।'

'সিজদা মানে নিশ্চিত মৃত্যু।'

বুড্ডা নির্বাক হয়ে গেল।

সে কিছুক্ষণ নীরব রইল।

গুরুজীর মুখখানা থমথম করছিল।

পাশের শিরিষগাছের ডালে কোনো পাখি ডাকেনি।

বুড্ডা বুঝতে পারল কথাটাকে এভাবে হঠাৎ ক'রে বলার দরকার ছিল। তৃতীয়বারের আগে কোনো কিছুর আকস্মিকতা প্রকাশ পায় না। তার মনে পড়ল তার বাবার কথা—বাজার থেকে এসে তিনি পরপর দুইবার বলতেন—বল তো তোমার জন্য কী এনেছি? তৃতীয়বার তিনি আর প্রশ্ন করতেন না। যা এনেছে তা বের ক'রে দেখাতেন। আর এজন্য বিস্মিত হওয়ার উত্তম সুযোগ থাকত। **বিস্মিত হওয়ার জন্য সুযোগের দরকার বটে। তা আকস্মিক, একথা ঠিক। তবে আকস্মিকতার অনুভূতির আগে উপযুক্ত প্রস্তুতি এবং পরিবেশের দরকারও আছে বটে।** —গুরুজী তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যকে তরল না ক'রেই আবারও বললেন—'নিশ্চিত মৃত্যু।'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

'ঠিক বলেছ।'

'এই ভয়ংকর সত্যটাকে সবার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়।'

'অথচ দেখ, অধিকাংশ মানুষ, বিশেষত যারা সিজদা করে, ব্যাপারটাকে জ্ঞানের মাধ্যমে না জানতে পারলেও অনুভূতিতে আঁচ করতে পারে। সাধারণ মানুষ প্রায়ই বলে যে তারা সিজদায় গিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। গা-হাত-পা জ্বলাপোড়া করে। দেহমন বিষ-বিষ হয়ে ওঠে। অনেকে অন্ধকারে একা একা নামাজ পড়তে পারে না। মারাত্মক ভয় পায়। কেন এরূপ হয়? এরূপ যে শুধু বাংলাদেশে হয় এমনটি নয়। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন—এসব আধুনিক দেশের উচ্চশিক্ষিত বীর মানুষেরাও একই অনুভূতির শিকার। কারণ কী? কারণ সিজদায় নফসের মৃত্যু ঘটতে থাকে। যেহেতু সে মরতে চায় না, সেহেতু সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। যারা নিজেদেরকে নফ্স থেকে আলাদা করতে পারেনি, তারা মনে করে যে ভয়টা তারাই পাচ্ছে।

মরার সময়ে যে-কোনো প্রাণী কী করে? বাঁচবার শেষ চেষ্টা করতে করতে প্রবলভাবে দাপাদাপি করে। টিকে থাকার বা survival এর বাসনা প্রত্যেকের মধ্যে জন্মগতভাবেই রয়ে গেছে। নামাজে নফসের মৃত্যু হতে থাকে ব'লে সে বাঁচবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে—দাপাদাপি শুরু ক'রে দেয়। এ কারণে অধিকাংশ লোক নামাজে মনকে কন্ট্রোল করতে পারে না। কিন্তু বেশি বেশি নামাজ পড়লে এবং আমিত্ব ত্যাগ করতে থাকলে নফ্স এক পর্যায়ে ম'রে যায়। আর তখনই শুরু হয় নবজীবন। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন, যদিও কোরআন পড়ার সময়ে তোমাদের চোখে তা ধরা পড়ে না। পড়বে কিভাবে? তোমরা আছ হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-

ইহুদী এসবের বিভেদ নিয়ে। যে বিভেদ আল্লাহ্ নিজে সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা মেলাতে কতটা সক্ষম তা জানার জন্য, তা নিয়ে মাতামাতি ক'রে তোমরা যে সাম্প্রদায়িক আনন্দ পাও, তাকে তোমরা ইমানি শক্তি বল। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন:

> হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে ***বিভক্ত করেছি*** বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, ***যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।*** তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক ***সাবধানী।*** আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, **সমস্ত খবর রাখেন।**
>
> **(৪৯:১৩)**

সাবধান! আগে পার্থক্যের ফয়সালা নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। পার্থক্য তো সৃষ্টি করাই আছে। তুমি মেলাবার চেষ্টা কর। পার্থক্যকে উস্কে দিয়ে নিজের হিংসাবৃত্তির চর্চ্চা করো না। আমাদের আলেমদের কেউ কেউ তা তাতেই ওস্তাদ। এ কারণে কোরআন তার রহস্য নিয়ে তাদের হৃদয়ে ধরা দেয় না। কি রহস্যময় কথা। আমরা সচরাচর ধ'রে নিই যে এক জাতীয় বা সমগোত্রীয় (Homogenious) বৈশিষ্ট্যধারী লোকের পরস্পরকে বেশি ভালো চিনতে পারে। অসমগোত্রীয়তা বা Heterogeneity-কে আমরা ঐক্যের এবং পারস্পারিক পরিচয়ের পথে বাধা হিসেবে ধ'রে নিই। এ কারণে যুগে যুগে মানুষ শুধু ***নিজের*** জাতি, ***অন্য*** গোষ্ঠীকে ঘৃণা ক'রে এসেছে। ফলে ঘটেছে অনেক রক্তপাত। মাত্র কয়েক বছর আগে সমাজবিজ্ঞানীগণ এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রের ও অর্থনীতির গবেষকগণ বহুজাতিক কোম্পানির বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে আগত কর্মচারীদেরকে ঐক্যপূর্ণভাবে ম্যানেজ করতে গিয়ে বিভিন্ন philosophy, principle এবং theory বের করেছেন। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব হলো Multiculturalism বা বহুকৃষ্টিবাদ। এই তত্ত্ব বলে যে, একটি কোম্পানীতে বহু কালচারের কর্মী থাকলে তাদের সবাইকে সমান গুরুত্বে দেখতে হবে এবং সবার কালচারকে সম্মান দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় ক'রে সফল কোম্পানীগুলো এই জ্ঞান দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা বুঝে ফেলেছে যে Homogeneity নয়, Heterogeneity-ই পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্র। সবাই এক রকমের হলে জীবনের কোনো মানে থাকত না। অথচ উপরোক্ত আয়াতে এই তত্ত্বের সবটুকু শক্তি এবং আরো অতিরিক্ত কিছু যে লুকিয়ে আছে, তার প্রতি এতকাল মুসলমানরা নজর দিল না। আল্লাহ্ কত চমৎকারভাবে বলেছেন—আমি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছি, এখন তোমরা ভেতরকার ঐক্যকে আবিষ্কার কর। আমি Heterogeneity সৃষ্টি করেছি, এখন তোমরা অন্তর্নিহিত Homogeneity-কে আবিষ্কার ক'রে আত্মপরিচয় লাভ কর।

নিজের সংকীর্ণ আমিত্বের ব্যাপারে ***সাবধান থাক***। কারণ আমি তোমাদের প্রতি ***কড়া নজর রাখছি।*** এই তত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে মানুষকে ভালোবাসার সব পথ অবলম্বন ক'রেও যদি কোনো ফল না হয়, বরং হিংসাপূর্ণ আঘাত আসতে থাকে, শক্তিপ্রয়োগের জেহাদ বৈধ হয় কেবল তখনই। কিন্তু আমরা করছি কী? আরেকটা আয়াত বিবেচনা কর:

> এবং তার নিদর্শনবলীর মধ্যে একটি হলো—তোমাদের ***ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।*** এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।
>
> (৩০:২২)

আহ! কি সুন্দর কথা! ***বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বর্ণ***—সাদা, কালো, বাদামী—সবই তাঁর সৃষ্টি। এরই মধ্যেই রয়েছে পরীক্ষা এবং ***জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন।*** কিন্তু জ্ঞানীরা তো এ নিয়ে খালি রিসার্স করছে, শিক্ষা তো নিচ্ছে না। সব ভাষাই তাঁর পছন্দের, তাহলে পাকিস্তান কেন বাংলাদেশের ওপর তার ভাষাকে চাপিয়ে দিচ্ছিল? বর্ণবাদ এখনও কেন 'উন্নত বিশ্বে' টিকে রইল? একটা কথা মনে রাখা দরকার—পরীক্ষা যিনি নিচ্ছেন, শেষ ফলাফলের আগে ভাইভা ভোসি বা মৌখিক পরীক্ষাটাও তিনি নেবেন। আমরা কি এখনও সাবধান হব না? তাহলে এবার শোনো আল্লাহ্ কিভাবে চূড়ান্ত টোনে কথা বলছেন:

> **ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন,** কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ***যা দিয়েছেন*** তা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেননি)। অতএব তোমরা ***ভালোকাজে প্রতিযোগিতা কর।*** আল্লাহ্র দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে জানাবেন।
>
> (৫:৪৮)

তিনি আমাদেরকে একজাতি করেননি ***বৈচিত্র্য*** সৃষ্টি করার জন্য। বৈচিত্র্য সৃষ্টি মানেই একেক জনকে একেক জিনিস দেয়া—***ভিন্ন*** ভাষা, ***ভিন্ন*** ধর্ম, ***ভিন্ন*** রং ইত্যাদি। কাউকে কিছু ***দেয়া*** মানে হলো অন্য কাউকে কিছু ***না-দেয়া।*** সুতরাং দেয়া এবং না-দেয়া উভয়ই পরীক্ষা। অথচ কেউ কিছু পেলে সে অন্যকে বিচার করে তাই দিয়ে যা সে (অন্যে) পায়নি। এবং যে কোনোকিছু পায়নি সে অন্যকে বিচার করে তার (অন্যের) পাওয়া দিয়ে। ফলে সবাই কেবল ***পার্থক্য*** নিয়ে মাতামাতি করে। এভাবে এমন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করে যার ফলে চোখ থাকে ***পার্থক্যের ওপর।*** এর ফলেই সৃষ্ট হয় বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা, হিংসা। অথচ পারস্পারিক ***মিলের*** ওপর চোখ রেখে যদি প্রতিযোগিতা চলত তাহলে তার নাম হতো ***ভালোকাজে প্রতিযোগিতা।*** তখন মূলনীতি হতো এরকম: আমরা উভয়ে ভালো, কিন্তু আমি তার চেয়ে ***আরো***

*ভালো*  হতে চাই। আল্লাহ্ আমাদেরকে কোরআনে এও বলেছেন—তোমরা খ্রিস্টানদেরকে তোমদের এবং তাদের মধ্যকার যে **মিলটুকু** রয়েছে, তার ভিত্তিতে আহবান কর। আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রেই কোরআনে ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলেননি, বলেছেন *শ্রেষ্ঠ* ধর্ম। শুধু তাই নয়, তিনি কোরআনের মধ্য থেকেও শ্রেষ্ঠ বিধানকে মানতে বলেছেন। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই তিনি একথা বলেছেন:

আর আমি তার [মূসা (আঃ) এর] জন্য কয়েকটি ফলকে লিখে দিয়েছিলাম **সর্বপ্রকার** উপদেশ ও **সর্ববিষয়ের** বিস্তারিত বিবরণ। (বলেছিলাম) সুতরাং এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং নিজের গোত্রকে আদেশ কর সেগুলোর মধ্যে *যা শ্রেষ্ঠ* তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে।

(৭:১৪৫)

আল্লাহ এভাবে বহুবার বলেছেন, এই কোরআনে *যা শ্রেষ্ঠ* তোমরা তা গ্রহণ কর যেমন (৩৯:৫৫)। এর কারণ কী? কারণ হলো—আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপান না (আয়াত ২৩:৬১)। সাধ্যেও আবার দিয়েছেন একেক ব্যক্তি (এবং জাতিকে) একেক রকমের। ফলে একেক জনের (জাতির) কাছে তাদের যোগ্যতা অনুসারে *শ্রেষ্ঠ* পন্থা হবে একেকটা, যদিও সবগুলো পন্থাই ভালো। এভাবে সবাই যদি তার সাধ্য অনুযায়ী *শ্রেষ্ঠ* বিধানটা মানতে যায়, তাহলে একদিকে প্রত্যেকে যেমন তার যোগ্যতার পূর্ণটুকু ব্যবহার করার সুযোগ পাবে, অন্যদিকে **ভালোর** সাথে **ভালোর** প্রতিযোগিতা হবে **অধিকতর ভালোর** ভিত্তিতে **শ্রেষ্ঠের দিকে**। তখনই হবে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা। আল্লাহ্ যদি তাঁর বিধানগুলোর মধ্যে *শ্রেষ্ঠকে* আগে টার্গেট করতে না বলতেন তাহলে শুধু টুপি-দাড়িতেই ইসলাম হয়ে যেত, ঈদ ও গরু কোরবানীতেই তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠকে ধরতে বলেছেন আগে—অর্থাৎ মন ও আচরণ পরিবর্তনকে এবং সমস্ত প্রতিযোগিতাকে *ভালোর* গন্ডির মধ্যে ধ'রে রাখাকে। বিধান দিতে গেলে তো তাতে **'সর্বপ্রকার'**-কে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু জীবনে গতি সৃষ্টি করতে হলে সেই সর্বপ্রকারের মধ্যেও *প্রকারভেদ* থাকা চাই, যেন ধাপে ধাপে উচ্চতরকে লক্ষ্য ক'রে সব সময়ে একটা প্রতিযোগিতা গ'ড়ে ওঠে। কোরআন নাজিলের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ ভালো থেকে অধিকতর ভালোর এই নিয়ম অবলম্বন করেছেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের অনেক প্রথাকে প্রথমে বিলুপ্ত না ক'রে সেগুলোকে বরং ব্যবহার ক'রে প্রথমে অন্যান্য দিকে মানুষের মনকে উন্নত ক'রে নিয়েছেন। পরে যখন তারা অতীতকে অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করল, তখন তিনি আয়াত নাযিল ক'রে তা বাতিল করলেন। কত সুন্দর পদ্ধতি! মনের development বা

বিকাশের সাথে বিধানের শ্রেয়ত্ব জড়িত থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তা না হলে তা ধর্ম হলো কিভাবে। ধর্ম মানেই তো স্বভাব। আল্লাহ্ চান মানবের যোগ্যতার ধাপে ধাপে বিকাশ। তাই তো তিনি বিবর্তন (Evolution) এর মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করলেন। বিবর্তন মানে সর্বদা ভালো থেকে আরো ভালোর দিকে **সংগ্রাম** ও **প্রতিযোগিতামুখর** গতি। এজন্য বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত প্রজাতিকে Survival of the fittest বা যোগ্যতমের উর্ধ্বতন পদগুচ্ছের মাধ্যমে উপাধি দেয়া হয়। অথচ যারা অজ্ঞ তারা এই সত্য বুঝতে না পেরে পুরোনোকে নিয়ে প'ড়ে থাকে এবং 'বাব-দাদার ধর্ম' ছাড়তে চায় না। আবার মুসলমানদের একদল উর্ধ্বমুখী গতিকে বুঝতে না পেরে লেবাস-তর্ক নিয়ে প'ড়ে থাকে।

***প্রতিযোগিতার*** ধারণা অস্তিত্বকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জগতের সবকিছুরই একটা ***মৌলিক*** দিককে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন অর্থনীতিকে তখনই মুক্ত অর্থনীতি বা Free Economy বলে যখন তাতে ***অবাধ প্রতিযোগিতা*** বা Competition থাকে। এ কারণে Free Economy কে Competitive Economy বা প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিও বলে। রাজনীতিতে যখন প্রতিযোগিতা থাকে তখন তাকে বলে গণতন্ত্র বা Democracy। শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকলে তাদের বিকাশ ঘটত না। প্রতিযোগিতার মধ্যে যদি মধু না থাকত তাহলে তোমরা World Cup খেলা নিয়ে এত মাতামাতি করার সুযোগ পেতে না। এখন বল তো, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিনোদন এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কি **খারাপ** আর ভালোর মধ্যে। তা না হলে কি অস্তিত্ব টিকে থাকত? আল্লাহ্ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রেই ঘোষণা দিয়েছেন যে:

নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর তেকে অন্য (উচ্চতর) স্তরে গমন করবে।

(৮৪:১৯)

সবচেয়ে ভালো যা তাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ না করলে কী হবে জান? বিবর্তন থাকবে না। বর্তমান বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় latest theory যেগুলো পড়ানো হয়, তাদের একটা হলো Laws of Thermodynamics. এই নামের অধীনে দুটো সূত্র পড়ানো হয়। প্রথম সূত্রটা অনুসারে:

Energy can be neither created or destoryed.

(শক্তিকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও দকরা যায় না)

অর্থাৎ মহাবিশ্বে শক্তির মোট পরিমাণ স্থির। পবিত্র কোরআনের একটি আয়তে একথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেকে **আলো** ব'লে চিহ্নিত করেছেন (সূরা নূর)। আধুনিক বিজ্ঞান জানে যে আলো মানেই শক্তি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের গবেষণার মূল বিষয় হলো আলো। আল্লাহ্ আরো বলেছেন যে আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করার কাজে **ক্লান্তি** তাঁকে **স্পর্শ** করেনি। এ এক চমৎকার কথা! এর অর্থ এই যে মহাবিশ্বের মোট শক্তি, যা আল্লাহ্‌রই শক্তি, স্থির—যা বাড়েও না, কমেও না। তিনি আয়াতুল কুরসিতে (২:২৪৫) বলেছেন যে তাঁকে নিদ্রা-তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না। অর্থাৎ তাঁর শক্তিতে ঘাটতি পড়ে না, তাঁর কুদরতের কার্যকারিতা কমে না।

কিন্তু Thermodynamics এর দ্বিতীয় সূত্র (Second Law) বলছে যে **একটি সিস্টেমের মধ্যে এনার্জির পরিমাণ স্থির হলেও শক্তি যত তার অবস্থা বদলাতে থাকে, তত তার অধিক কাজ উৎপাদন করার ক্ষমতা বা দক্ষতা কমতে থাকে।** এরূপ ঘটে কোনো **আবদ্ধ** সিস্টেমে। এর কারণ কী? বিজ্ঞান এখনও তা জানেনি। আমি বলছি এর কারণ। এর কারণ হলো এই যে, শক্তি দ্বারা যখন কোনো কাজ (যেমন: গতি সৃষ্টি) করা হয়, তখন ঐ কাজের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রবাহ ঘটে। এই প্রবাহের ফল হলো শক্তির বিভিন্ন **রূপান্তর** (Transformation) ঘটা। কিন্তু শক্তির প্রবাহ একটা বিশেষ মুহূর্তে *এক-মুখী* (One-way)। ফলে, উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন কোনো কাজ এক নাগাড়ে ক'রে যেতে থাকে, তখন তার দেহমনের মধ্য দিয়ে শক্তির একমুখী প্রবাহ তার কাজের দক্ষতা ও মনের বিন্যাসে একটা প্যাটার্ন বা ছক আরোপ করে। ফলে উক্ত কাজ তার **অভ্যাসে** (বিজ্ঞানের ভাষায় **জড়তা** বা inertia) পরিণত হয়। অভ্যাস গড়ে ওঠার কারণে মানুষ **অভিজ্ঞতা** লাভ করার পর কোনো কাজ অত্যন্ত সহজে ও স্বাচ্ছন্দে করতে পারে। কিন্তু তার কুফলও আছে। অভ্যাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে গেলে এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি না ঘটতে থাকলে মানুষ অভ্যাসের দাস হয়ে যায়। তখন সৃজনশীল চিন্তা করা তার দ্বারা কঠিন হয়ে যায়। সৃজনশীলতা হলো পুরনো প্যাটার্ন বা ছক থেকে বের হয়ে এসে নুতন কিছু করা এবং ভাবা। কিন্তু অভ্যাস মানুষের কাজকে সুবিধাজনক ক'রে দেয় ব'লে সে সেই সুবিধা ভোগ করতে করতে অলস হয়ে যায়। তখন অভ্যাসের সুবিধাকে ভোগ করতে করতে নিজের অজান্তেই আরাম-আয়েস ও আলসেমিকে উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়ে নেয়। তখন তার ভেতরে যে শক্তি আছে তার কার্যকারিতা একদিকে বাড়লেও একদিকে ক'মে যায়। সে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে যায়। নিজের চিন্তা ও স্বভাবের বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। কুয়োর ব্যাঙ আজীবন লাফিয়েও কুয়ো থেকে বের হয়ে আসতে পারে না,

কারণ সে কুয়োর মাফের লাফ দেয়। একেই বলে **এনার্জি ব্যারিয়ার**। শক্তির এই দক্ষতার হ্রাসকে বলে entropy বা ক্ষয়।

বিষয়টা নিউটনের প্রথম সূত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও আলোচিত বা মূল্যায়িত বা অন্তর্ভূক্ত হয়নি: বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চাইবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকতে চাইবে। বস্তুর এই ধর্মকে বলে inertia বা জড়তা। এ হলো বস্তুর ***অভ্যাস। শক্তির ক্রিয়া একমুখী ব'লে তাকে একই কাজে যত ব্যবহার করে তত ঐ কাজের যোগ্যতায় তার শক্তি বেশি বেশি মজুদ হতে থাকে। ফলে তার পক্ষে একটা সীমার পরে ঐ কাজ থেকে স'রে আসা সহজ হয়ে ওঠে না।*** এটাই entropy। এজন্য দেখা যায় যে খুন চিরকাল খুনই ক'রে যাচ্ছে; সাধক চিরকাল উপরের দিকেই যেতে থাকছে; মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচার চিরকাল বাড়তেই থাকছে; ধর্ষণকারীর কু-ইচ্ছা তাকে বেশি বেশি ক'রে আটকে ফেলছে......। এ কারণে গুরু সব সময়ে তার শিষ্যকে দিয়ে প্রথম দিকে এমন কঠোর সাধনা করান যেন তার মাধ্যমে তার আবেগের সমস্ত এনার্জিটুকু একদিকে—অর্থাৎ কেবল ভালো কাজের দিকে—ব্যায়িত হয় এবং তার দ্বারা আর খারাপ কাজে ফিরে যাওয়া সহজ না হয়। এ হলো entropy-র ভালো দিক। আল্লাহ্ সূরা লাইল-এ (৯২) ৪ থেকে ১০ নং আয়াতে যা বলেছেন তার সারংশ ও ভাবার্থ হলো:

> কেউ ভালো কাজ করলে আমি তার জন্য ভালো কাজ করা ***সহজ ক'রে দেব*** এবং খারাপ কাজ করলে আমি তার জন্য খারাপ কাজ করা **সহজ করে দেব** এবং তাকে কঠোর পরিণামের দিকে চালিত করব।

কি চমৎকার কথা! কোনো মানুষ কি কখনও এভাবে কথা বলেছে? সূরা আ'লাতে (৮৭) আল্লাহ্ রসূল (সঃ) কে বলছেন:

> আর আমি তোমার জন্য সরল/সোজা পথকে ***সহজ ক'রে দেব।***
>
> (৮ নং আয়াত)

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ entropy-র কথাই বলছেন, আর কিছু নয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ বলেননি—কেউ খারাপ কাজ করলে সে ***খারাপ হয়ে যাবে***। বরং তিনি বলছেন—......***আমি তাকে খারাপ*** পথে চালিত করব। কোরআন যদি কোনো মানবে রচনা করত তাহলে সে আল্লাহ্র ঘাড়ে দোষ না চাপানোর জন্য কথাটাকে প্রথম স্টাইলে বলত। কিন্তু আল্লাহ্ দ্বিতীয় স্টাইলে কথা ব'লে **নিজেই নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে নিচ্ছেন**। তিনি বলেছেন—আমি হাসাই; আমি কাঁদাই; আমি বিভ্রান্ত করি; আমি দূরে ঠেলে রাখি; ইত্যাদি। সবকিছুতে আল্লাহ্র এই ***সক্রিয়*** ভূমিকার কারণে কোরআন পড়তে গেলে যারা

অহংকারী তাদের অহংকার ও ক্রোধ বেড়ে যায়। আর যারা বিনয়ী তাদের ভয় বেড়ে যায়। কি চমৎকার! অথচ এটা কোনো নিচক রচনার স্টাইল নয়। এটাই হলো *সত্য*। কারণ কেউ যখন কোনো কাজ করে, তখন উদ্দেশ্য বা নিয়তটা তার, কিন্তু তাতে শক্তি যোগান তো আল্লাহ। তিনিই তো শক্তি। তাহলে **কোনো ব্যক্তিকে শক্তি ছাড়া যেমন অন্য কিছু কোনো উপকার করতে পারবে না, তেমনি শক্তি ছাড়া অন্য কেউ তাকে ধ্বংসও করতে পারবে না**। এতো নিউট্রাল সত্য—পক্ষপাতিত্ব নয়। অথচ যাদের অন্তর বেঁকে গেছে তারা আল্লাহ্‌র এরূপ বিবৃতি শুনে অহংকারী হয়ে ওঠে। বলে—সবই যখন তিনি করেন, তখন আমার কী দোষ? গোটা কোরআন জুড়ে আল্লাহ্ এভাবে active voice-এ বা কর্তৃবাচ্যে কথা বলেছেন। কেউ কেউ—বিশেষত কিছু ভ্রান্ত মারেফতপন্থী—এর মূল রহস্য না জেনে বিভ্রান্ত হয়ে ব'লেও বেড়ায়—যেমনে নাচাও তেমনে নাচি....তারা আল্লাহ্‌র বাণীর এই কঠোর প্রত্যক্ষতা সহ্য করতে না পেরে কেবল তার গোপন অর্থ খুঁজে বেড়ায়। অথচ কথা ছিল তাঁর বাণীর উভয় ডাইমেনশনকে ***একই সাথে*** গ্রহণ করার। ভয়কে সাদরে গ্রহণ করলেই ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু ভয়ে অহংকার ধ্বংস হয় ব'লে অহংকারীরা ভয়কে বিকর্ষণ করে এবং নেশাখোরী প্রেমের মাতমের মধ্যে লুকিয়ে বাঁচতে চায়। মাঝে-মাঝে ভয় পেলে দোষ দেয় আল্লাহ্‌র। না, তাঁর কোনো দোষই নেই। সাম্প্রদায়িক 'ধার্মিকেরা' আবার আল্লাহ্‌র কথার এই টোনের গূঢ়ার্থ বুঝতে না পেরে বলে—আল্লাহ্ চাননি ব'লে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী হবার যোগ্যতা পায়নি। কথাটা তারা এমন ভঙ্গিতে এবং বিশ্বাসে বলে যেন আল্লাহ্ তাদেরকেই শুধু ভালোবাসেন আর অবিশ্বাসীদের দয়া করেন, বরং তাদের সাথে শত্রুতা করেন। কোরআনে আল্লাহ্‌র active voice রহস্যময়। এই রহস্যের ভেতরে এখন প্রবেশ করব না, তবে যেটুকু বললাম তা মনে রেখে আবার কোরআন প'ড়ে দেখ—দেখবে যে কোরআন তোমার সাথে কথা বলছে। তা জীবন্ত গ্রন্থ!

তো, যা বলছিলাম.....শক্তির একমুখী গতির কারণে ভালো তেকে আরো ভালোর দিকে এগোতে না থাকলে **তারই নাম হবে পিছিয়ে পড়া**। প্রতি মুহূর্তে মহাবিশ্বে entropy ঘটছে। শক্তিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সিস্টেমের এবং মানুষের দক্ষতা ক'মে যাচ্ছে। এজন্য এখানে একই গতিতেও চলা যাবে না—চলতে হবে ত্বরিত (accelerated) গতিতে—দ্রুত থেকে আরো দ্রত। **শুধু ভালো নিয়ে প'ড়ে থাকা যাবে না—ভালোকে ছেড়ে আরো ভালোর দিকে ছুটতে হবে**। আবারও বলছি—entropy! মারাত্মক! এর কারণেই মন বৃত্তে আটকে যায়। এর কারণেই প্রত্যেকের জন্য এমন এক মুহূর্ত আছে—যার পর তওবার দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর তার তওবা কবুল হয় না—অর্থাৎ তারপর তার আর **তওবা করার ইচ্ছাই জাগে না বা তওবা করাকে তার কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয় না**। এই ঘটনাকে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন—আমি ওদের অন্তরে তালা দিয়েছি, কানে ছিপি দিয়েছি। .....আমি ওদের ঘাড় সোজা

ক'রে দিয়েছি, ওরা মাথা নোয়াতে পারবে না। .....কারণ ওদের শক্তির কর্মদক্ষতা ***একমুখী*** হয়ে গেছে। আল্লাহ্ নিজেই ওদের অন্তরে সিলমোহর ক'রে দেন—আর কেউ না। শক্তিই শক্তির ***একমুখিতা*** বাড়িয়ে দেয়, এবং ফলে অন্য ডাইরেকশনে তার দক্ষতা দমিয়ে দেয়। কত বিজ্ঞানসম্মত কথা! অথচ অহংকারীরা এই জাতীয় আয়াতকে আল্লাহ্‌র দিকেই ছুড়ে মারে। আর তাতে তাদের তালা আরো মজবুত হয়ে যায়!

আবারও মূল কথায় ফিরে যাই। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন যে তিনি কোরআন পাঠিয়েছেন বর্তমান ইসলাম ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ইসলামের তথা ধর্মের মধ্যে ফয়সালা ক'রে দেয়ার জন্য (আয়াত: ১৬:৪৪)। ফয়সালা মানে কী? মিটিয়ে দেয়া। কই, আমরা তো কেবল পার্থক্যই তুলে ধরছি, মিলটুকু তুলে ধরছি কই? আমরা অনেকেই মনে ক'রে বসেছি যে কোরআন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর কারো নয়। আর এই সুযোগে কোরআন তথা ইসলামের সাথে অন্যান্য গ্রন্থের ও ধর্মের যে মিলগুলো আছে তাকে পুঁজি ক'রে সারাবিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের ও অধর্মের (নাস্তিক) পণ্ডিতরা বলছে যে ইসলাম হলো সবার থেকে নিয়ে জোড়া-তালি দেয়া ধর্ম। কোরআন হলো সুকৌশলে এবং ধার-ক'রে রচিত গ্রন্থ। আধুনিক যুগের সব বিখ্যাত নাস্তিক পণ্ডিত—দেশি ও বিদেশি—তাদের অনেক বইতে তথ্য-প্রমাণাদি সহ এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এ কথা অনেকেরই জানা ব'লে আমি কোনো বিশেষ উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ্ আগে থেকেই কোরআনে বলে রেখেছেন তারা কী বলবে। সুতরাং তারা নতুন কিছু বলতে পারছে না। এই আয়াতগুলো বিবেচনা কর:

> অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়; মুহম্মদ এ উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে ও মিথ্যা বলে। ওরা বলে, 'এগুলো তো সেকালের রূপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে।'
>
> (সূরা ফোরকান: ৪-৫)

এরকম অনেক অভিযোগকে আল্লাহ্ কোরআনে প্রকাশ ক'রেই রেখেছেন। অবশ্য অজ্ঞ মুসলমানের আচরণের কদর্যতা দেখে যাদের মনে আগে থেকেই **ঘৃণা-মিশ্রিত সন্দেহ** ঢুকে যায়, তারা যখন কোরআন পড়ে তখন তাতে আর কিছু পায় না। সন্দেহ ভালো—সন্দেহ না থাকলে কেউ সত্যকে সন্ধান করত না, সবকিছুকেই সত্য বলত—**কিন্তু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত সন্দেহ** ভালো না। একমাত্র **আগ্রহ-মিশ্রিত সন্দেহই** পারে জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিতে। আমার মনে হয় অনেক উদার নাস্তিকের সন্দেহের সাথে ঘৃণা যুক্ত হওয়ার জন্য কূপমণ্ডুক ধার্মিরাই দায়ী। আমার মনে হয় এর দোষ শুধু তাদের নয় যারা একথা বলছে—আমাদেরও।

'গুরুজী, কোন আয়াতে যেন বলা হয়েছে যে নামাজ নফসের মৃত্যু এবং নবজীবন দান করে?'

'আল্লাহ্ বলেছেন:

......তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং বিকালে ও দুপুরে [অর্থাৎ চার ওয়াক্তের নামাজের কথা বলা হচ্ছে]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

(সূরা রুম: ১৭-১৯)

প্রত্যেক নামাজে তোমাদের **লক্ষ্য স্থির রাখবে** এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে **ফিরে** আসবে।

(সূরা আ'রাফ: ২৯)

তুমি কি পার লক্ষ্য স্থির রাখতে? অহংকার ত্যাগ না করলে তা সম্ভব নয়। তোমাকে ফিরে যেতে হবে সেই **লক্ষ্যের** দিকে। লক্ষ্য ঠিক থাকলে মৃত্যুর নিশানা ব্যর্থ হবে না, এবং মৃত্যু হচ্ছে দেখলে বুঝতে হবে লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হয়নি। সুতরাং তোমার লক্ষ্য ভুল হলে ভুল ঘাটে গিয়ে নৌকা ভিড়ে যাবে। নামাজে যে সৃষ্টি-ধ্বংসের কাজ চলে তা প্রথমত আত্মিক তারপর মানসিক তারপর দৈহিক ডাইমেনশনে কাজ করে। সুতরাং সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ পড়। তাহলেই সঠিক পদ্ধতিতে মৃত্যু এসে তোমাকে নবজীবন দান করবে।'

'গুরুজী, তারপরও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না নামাজ তথা সিজদা মৃত্যু কি না।'

'শোনো তাহলে। মানুষ মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তাকে ভুলে থাকে। তেমনি সে নামাজকেও এড়িয়ে চলতে চায়। এমনকি নামাজীও নামাজের মধ্যে সূরা রাকাত ভুলে যায়। মৃত্যুর সময়ে মনটা পেছনমুখী হবে। আল্লাহ্ নিজেই তা বলেছেন। নামাজেও মনটা অতীতের দিকে ছোটে। কোন কাজটা বাকি রইল, মনটা কি খেতে চেয়েছিল, কোন মহিলাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, ব্যবসায়ে আরো কত টাকা বেশি লাভ করার প্ল্যান ছিল—এসব স্মৃতিই নামাজের ৯০ শতাংশেরও বেশি স্থান দখল ক'রে নেয়। সর্বশেষ যে জ্বলন্ত প্রমাণটা দেব তা পেয়ে তোমার ভয় পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। মৃত্যু মানে কী? মৃত্যু মানে আল্লাহ্‌র সাথে মিলন। আল্লাহ্ কোরআনে তাই-ই বলেছেন। অর্থাৎ কামেল হোক, জ্ঞানী হোক, কাফের হোক, মোনাফেক হোক—সবাইকে আল্লাহ্ নিজের কাছে টেনে নেন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তাকে বলে মৃত্যু। নামাজ মানেও হলো আল্লাহ্‌র সাথে মিলন। অর্থাৎ দুইয়ের প্রক্রিয়া এবং ফলশ্রুতি হুবহু এক। নামাজের সময়ে সামান্য এক ফোঁটা ওজুর পানিও যদি কপালে বা হাতে কোথাও বিড় বিড় করে, তাহলেও মনে হয় যেন

চামড়ার ওপর দিয়ে ট্রাক চ'লে যাচ্ছে। মনে হয় জায়গাটাকে ড'লে পিষ্ট করে ফেলি। অধিকাংশ লোকে তো এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নামাজের মধ্যে সারাক্ষণ গায়ে-মুখে হাত ঘষে, হাই তোলে। এভাবে তাদের নামাজের অধিকাংশই তারা নিজেরাই নষ্ট ক'রে ফেলে। যাহোক, কেন এরূপ হয়? কারণ নামাজের সময়ে গোটা স্নায়ুতন্ত্র ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে মানুষের **ব্যাথা পাবার ক্ষমতা বেড়ে যায়।** এক টুকরো ভ্রু বা চুলের আঘাতকেও তখন বুলডোজারের নিষ্পেষণ ব'লে মনে হয়। **মৃত্যুর সময়েও একইভাবে আমাদের ব্যাথা পাবার ক্ষমতা বেড়ে যায়।** তার ওপর চলে আযরাইলের স্টীমরোলার। ফলে ব্যাথাটা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে মৃত্যুর পরও সমস্ত শরীর ব্যাথায় টলমল করে। এ কারণে মৃতদেহকে আলতোভাবে গোসল করাতে বলা হয়েছে। মৃত্যু যন্ত্রণার ফলশ্রুতি হাজার বছর ধ'রেও দেহে সক্রিয় থাকতে পারে। ঈসা (আঃ) এমনও মৃতদেহকে জীবিত করেছিলেন যার মৃত্যু হয়েছিল হাজার বছর আগে অথচ তার শরীর তখনও প্রবল ব্যাথায় টস্‌টস্‌ করছিল। সুতরাং সাবধান! যত বেশি আল্লাহ্‌র ধ্যান করবে ও জগৎ ত্যাগ করবে তোমার দেহ ততই বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়বে। এমনও এক সময় আসবে যখন একটা পিঁপড়ের কামড়কেও মনে হবে কেয়ামত। এই যন্ত্রণা মৃত্যুরই যন্ত্রণা।'

'জ্বী গুরুজী, এই ব্যাথার সাথে কিছুটা পরিচয় আছে।'

'বেশি বেশি সাধনা করতে থাক। এমনও সময় আসবে ইনশাল্লাহ্‌ যখন তোমার জন্য নির্ধারিত সমস্ত ব্যাথাটুকু সাধনা ও প্রেমের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন মৃত্যু হবে তোমার জন্য মরুপথযাত্রীর কাছে এক গ্লাস বরফের শরবতের মতো।'

'আহ্‌!'

'কিন্তু সেই স্তরে পৌঁছাতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।'

'অত কাঠ-খড় পাব কোথায়?'

'আমি তো দেখছি তোমার গোটা দেহ-মনই শুকনো কাঠ-খড়। তোমার শুধু অভাব আগুনের।'

'গুরুজী, আগুন ধার ক'রেও দেখেছি। তেমন কাজ হয় না। ঝামেলায় পড়তে হয়। বাতের রোগীও এমন আগুন ব্যবহার করে যার আলো নেই। অনেকে আবার আলো দিতে চায় কিন্তু আগুন দিতে চায় না।'

**‘প্রেমের আগুন ধার করা যায় না। তা কোনোকিছুকে না পুড়িয়ে আলো সৃষ্টি করতে পারে না।’**

‘এখন আমি কি তাহলে ধার করা বাদ দিয়ে প্রমিথিউসের মতো আগুন চুরি করতে শুরু করব, গুরুজী?’

‘চুরি করা তোমার বহু আগের অভ্যাস। যে অভ্যাসকে আয়ত্ত ক’রে ফেলেছ তাকে কাজে লাগানো ভালো। চেষ্টা ক’রে দেখ।’

‘কিন্তু ধরাও তো পড়ি।’

**‘প্রেমের আগুন চুরি করার ক্ষেত্রে সার্থকতা হলো ধরার পড়ার মধ্যে।’**

‘ওহ! তাহলে তো চিরাচরিত অভ্যাসটাতে এবার লাভ দেবে।’

‘অত খুশী হবার কিছু নেই। এই আগুন যেখানে থাকে সেখানে কোনো পাহার নেই। কে ধরবে তোমাকে?’

‘মানে?’

‘চুরি করার পরে তোমাকে কেউ ধরবে না। ধরবে আগে। এটা পাহারা নয়, বাধা।’

‘মানে আগুন ছাড়াই ধরা পড়ব?’

‘তাই।’

‘আর যদি আগুন পেয়ে যাই?’

‘তাহলে তুমিই হবে সেই আগুনের পাহারাদার।’

বুড্ডা কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করল—‘আর আমি যদি সে আগুনে পুড়ে যাই?’

‘তাহলে জগতের সমস্ত আগুন-চোর তোমার লেলিহান শিখায় এসে ঝাপ দিয়ে আত্মাহূতি দেবে।’

বুড্ডার কাঁপা বন্ধ হয়ে গেল। সে উত্তেজনাহীন পাথরের মতো মিনিট দুয়েক চুপচাপ বসে রইল।

‘মনে হচ্ছে এখন তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারলে খুশি হতে।’

‘কী করব গুরুজী। ভেতর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। ভাবছি কী করা যায়।’

‘বেশ তো। শুনাও, শুনি। পোড়ার সুযোগ সবসময়ে আসে না।’

বুড্ডা তার আবেগের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আবৃত্তি করলঃ

আলো বললেন, ‘আগুনের পূজা কর না।’

তাই আমি আলোর পূজারী

কিন্তু আগুন ছাড়া আলো হয় না দেখে

আগুনকে করেছে পূজা প্রবীণ পৃথিবী

আগুনে পোড়েনি মূসা, তুর পাহাড় হয়ে গেল ছাই।

আগুনের আকর্ষণে গিয়ে সেই নিকটস্থ বৃক্ষের দর্শনে

আলো নিয়ে এসেছিল ফিরে

গোপনে আগুন নিয়ে খেলা করা ভালো

এবং প্রতিটি নর ও নারীর আছে নিজস্ব গোপন

অথচ পোড়ার প্রান্তে যে পুড়ল সে নেই

ব্যক্তি মানে অন্ধকার—ছোট একটি ঘরের কোনাচ

এ কারণে ব্যক্তি পুড়ে আলো হলে পর

ভরা হাটে হাড়ি যায় ভেঙে

সীমাহীন গোপন-গম্বুজে

গোপন কখনও কারো একার থাকে না।

তাইতো বলি কখনও পুড় না

এমন আগুনে যার ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

আরো অনেকের মতো আমিও পুড়িনি

কদাচিৎ হয়তোবা ভুলে-ভালে পুড়িয়েছি ছোট-খাট ঘর

প্রতিবেশি কিছু ঘর পুড়ে খাক হয়ে গেলে শেষে

ছাইয়ের ওপর বসে দেখলাম কল্পনার চোখে

আমার বাবার ঠান্ডা চোখদুটো অগ্নিগর্ভ তারা

আমার গুরুর চোখে সরাইয়ের উনুন জ্বালানো

যখন তা সাগর চায় তৎক্ষণাৎ জলহীন মরু

ফলত লুকিয়ে আছে বালুকার গভীর প্রদেশে

ধ্বংসের নিদর্শনগুলি;

        সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে

শত বস্তা ছাই ঢেলে দিয়ে

আমি একা বসে থাকি বৃক্ষের স্বভাবে

জয়তুনের অপেক্ষায়।

আলোর ওপরে আলো—

মৌলিক খেলা দেখা এখনও হলো না তবু শুরু।

একথা সত্য বটে, এখন বুঝেছি—

মনুষ্য জাতির জীব কেন করে আগুনের পূজা:

পুড়বার ভয়ে ভীত উল্টোমুখী আদম সন্তান

আগুনকে দূরে রাখে প্রহরীর মতো;

আত্মরক্ষা অনেকাংশে আমিত্বের পূজা

এ কথা না বুঝে।

অথচ ইব্রাহিম আগুনের বাগানে ব'সে

নিয়েছিল বেহেস্তের শ্বাস।

নমরুদ জ্বালে চিতা—

ইব্রাহিম হাবুডুবু প্রেমে

অথচ নমরুদ দেখে প্রজ্বলিত উত্তপ্ত দোজখ।

আপাতত আমি এক আগুনের লোক;

করি নাই আগুনের পূজা।

আলোর ইশারা আসে অগ্নিকুণ্ড-কেন্দ্রস্থান থেকে

অগ্নিমুখী এই যাত্রা তাই।

এই যাত্রা শেষ হলে দেখা যাবে আলোর জগৎ:

আগুনে আলোক দেয়—প্রচলিত এই মতবাদ ভ্রান্ত ক'রে দিয়ে

জানা যাবে আগুনের মূলে আছে শুদ্ধতম আলো।

'চমৎকার! তুমি যদি আগুন জ্বালতে পার তাহলে আলোও পাবে। তা দিয়ে গোটা মানবজাতি উপকৃত হবে, কেউ তা জানুক বা না জানুক।'

'কিন্তু সে আলো কোথায় আছে, গুরুজী?'

'ঠিক এই মুহূর্তে—না অতীতে না বর্তমানে। মনকে ঠিক এই মুহূর্তে স্থির রাখ। চেষ্টা ক'রে দেখ। পদ্ধতিটা হলো: যেভাবে সুবিধা পাও আরামে ব'সে থাক। রিল্যাক্স কর। তারপর নিজেকে বল—এই মুহূর্তে আমার কোনো অতীত নেই। এই ব'লে মনকে ঠিক এই মুহূর্তে ধ'রে রাখ। তারপর বল—এই মুহূর্তে আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তারপর মনটাকে ঠিক এই মুহূর্তে ধ'রে রাখ। তারপর বল—এই মুহূর্তে আমার জন্য আছে কেবল এই মুহূর্তটাই, অর্থাৎ বর্তমান। অতীতের স্মৃতি নেই, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বা কামনা নেই। আমার কোনো আফসোস নেই। আমি আনন্দিত। মাত্র এক

মুহূর্তের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার মতো সাহসী হও। লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে আল্লাহ্‌র পথে সাধনায় কতখানি সাহস দরকার তা শিখিয়েছিলেন:

> হে বৎস!.......বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই তা **সাহসের** কাজ।
>
> (৩১:৭)

মনে দুশ্চিন্তা আসে হতাশা থেকে—বিপদ-আপদ হবে এই ভয় থেকে। এক্ষেত্রে **ধৈর্যধারণ করা তো তখনকার ব্যাপার যখন বিপদ এসে উপস্থিত হয়।** তা যখন আসবে তখন ধৈর্যধারণ করা সাহসিকতার ব্যাপার। আর তা আসার আগে তা নিয়ে আতংকিত থাকা হলো কাপুরুষতা। আর **আদৌ কোনো বিপদ আসুক বা না আসুক, তা আসার আগেও তা নিয়ে আদৌ চিন্তা না করা হলো প্রকৃত বীরত্ব।** অবশ্য এই বীরত্ব কেবল তাদের জন্য দরকার যারা সাধনায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অন্যদের জন্য আতংকিত থাকাই দরকার যা আল্লাহ্‌ নিজে কোরআনে বলেছেন:

> যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে মাটির নিচে (ভূমিকম্প দ্বারা) বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না যা ওদের ধারণাতীত? অথবা **চলাফেরার সময়ে** [অর্থাৎ রোড অ্যাকসিডেন্ট, বিমান দুর্ঘটনা] তিনি ওদেরকে পাকড়াও করবেন না?
>
> (সূরা নাহল: ৪৫-৪৬)

এখানে আল্লাহ্‌ তাদেরকে শংকিত থাকতে বলেছেন যাদের মনে পাপের ষড়যন্ত্র বা কুরিপু বারবার জাগে। প্রতিবারই তাদের এই শাস্তির আতংকে থাকতে হয়। তাতে মনের অহংকার কমে, শাস্তি থেকেও রেহাই পাওয়া যায়, এবং মন পরিষ্কার হয়। **তওবার পর থেকে বেশ কিছুকাল এই আতংকই হলো সাধনার প্রধান অংশ।** অথচ এই আতংকের কথা না শুনিয়ে অনেক মোল্লা কেবল আল্লাহ্‌র রহমত নিয়ে ওয়াজ করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) দিনে কমপক্ষে সত্তরবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলেছেন। যাহোক, তোমার স্তরে এই আতংক রাখতে হবে বটে, তবে কেবল তখনই তুমি তা করবে যখন মনে পাপ চিন্তার উদয় হবে। অবশ্য **যাদের তওবা কবুল হয়ে যায়, তাদেরকে আর ইচ্ছা ক'রে আতংকিত হওয়ার দরকার হয় না, কোনো ভুল হতে থাকলে আল্লাহ্‌ নিজের করুণায়ই তাদের মনে আতংক সৃষ্টি ক'রে দেন।** কারো কারো হার্টবিটও বেড়ে যায়, যেমন আমার হয়ে থাকে। যাহোক, পাপের ফলের আতংক আর ভাগ্যনির্ধারিত বিপদাপদের আতংক এক কথা নয়। বিপদাপদে দৃঢ় থাকতে হবে। তোমার ক্ষেত্রে যা বললাম তাই পালন করবে। জগতের সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে চোখদুটো বন্ধ ক'রে মনটাকে ঠিক এই মুহূর্তের বর্তমানে ধ'রে রেখে চোখের সামনে বা হার্টের মধ্যে আরবিতে লেখা

‘আল্লাহ্’ শব্দটাকে কল্পনা করবে। ব্যস। এভাবে পড়ে থাকবে। আগামীকাল সকালে আমাকে বলো কতটা এগিয়েছ।

আট

## মৃত্যুপুরীতে জীবন-নাটক

বুড্ডা গুরুজীর সাথে জোহরের নামাজ প'ড়ে বেরিয়ে পড়ল লোকালয়টা দেখবে ব'লে। সে প্রায় ঘন্টার পাহাড়ী পথ হেঁটে একটি ক্ষুদ্র লোকালয়ে এসে পৌঁছল। লোকলয়ে প্রবেশ ক'রে সে হাঁটতে লাগল প্রধান সড়ক দিয়ে। গ্রামটার প্রায় মধ্যিখানে সে দেখল একটি বড় গাছ। গাছটি ঠিক বটগাছও নয়, কিন্তু বটগাছের মতোই বড়। তার শাখাপ্রশাখাগুলি এত বেশি প্রসারিত যে সেগুলি পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে এমন একটি ছায়া দিয়েছে যার মধ্যে বিশাল একটি জনসভা বসতে পারে। সে ভাবল—আল্লাহ্‌র আরশের দিকে যাওয়ার সময়ে যেসব উল্লেখযোগ্য জিনিস দেখা যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল গাছ। ভ্রমণের সময়ে গাছের নিচে বিশ্রাম করা খুব ভালো অভ্যাস। সে দেখল যে গাছটির ছায়ার মধ্যে একটি সুন্দর অথচ ছোট মঞ্চ তৈরি ক'রে রাখা আছে। মঞ্চটি সুন্দরভাবে সাজানো।

সে আরো অবাক হলো এই দেখে যে মঞ্চটিকে ঘিরে কয়েকশত লোক চুপচাপ ব'সে আছে। তাদের চোখে-মুখে এমন প্রবল আগ্রহ যে তারা যেন তাদের কোনো প্রাণপ্রিয় নেতার মুখ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী শুনছে। অতচ মঞ্চে কেউ নেই।

বুড্ডা ভিড়ের কাছে অদূরে গিয়ে দাঁড়াল। সে গোটা মজলিসকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল— যদি ভেতরের খবরটা কিছু আঁচ করা যায়। গোটা মজলিস যেখানে ব'সে আছে সেখানে একটিমাত্র লোক দাঁড়িয়ে থাকলে সে সবার নজর কাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে সবাই তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে পড়ল। বুড্ডা লজ্জা পেল। সুতরাং সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই ব'সে পড়ল।

সবাই তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সে স্বস্তি পেল। সে অবশ্য কাউকে কোনো প্রশ্ন না ক'রেই অন্যদেরকে অনুসরণ করল।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পরও কোনো কিছু ঘটছে না দেখে সে পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল—'এই যে ভাই, এখানে আমরা সবাই ব'সে আছি কেন?'

লোকটা একচোখ সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকাল। বুড্ডা তার চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল।

সে আরো মিনিট দশেক পর লোকটাকে আবারও প্রশ্ন করল—‘ভাইজান, এখানে কি কিছু ঘটবে?’

লোকটা এবার স্বাভাবিকভাবে তার দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল যে বুড্ডা একজন নবাগত ব্যক্তি। তার পরনে চট দেখে সে খুব ভয় পাচ্ছিল। কারণ এই গ্রামের লোকজনরা চট-পরা লোকদের খুব বেশি ভালোবাসে। একথা সে গুরুজীর কাছে জেনেছিল। লোকটা জবাব দিল—‘আমরা তো তাই কামনা করি।’

‘ঠিক বুঝতে পারলাম না।’

‘তা না ঘটা পর্যন্ত আমরাও তো বুঝতে পারছি না কী ঘটা উচিৎ।’

‘এ তো এক অদ্ভুত কথা, ভাই। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?’

‘বুঝিয়ে আর কী বলব? আমরাই তো নিজেরা কেউ ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বুঝতে পারছি না।’

লোকটার কথার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বুড্ডা চুপ ক’রে রইল। লোকটা খানিক থেমে নিজের ব’লে চলল—‘বহুকাল ধ’রে আমরা এই মঞ্চটাকে পাহারা দিচ্ছি। প্রতিদিন এখানে এসে অপেক্ষা করি, আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য নীরবতা পালন করি, ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য চোখের পানি ফেলি। কিন্তু তিনি আসেন না।’ —তার গলা ভিজে এল—‘এদিকে বহুকাল যাবত আমাদের গোটা লোকলয়ে তেমন কিছু ঘটছে না।’

‘তেমন কিছু ঘটছে না মানে?’

‘তেমন ভালো কিছু ঘটছে না। যা ঘটছে সব এলোপাথাড়ি, বিশৃঙ্খল ঘটনা। এ রাজ্যের একমাত্র বর্তমান রাজা হলো অরাজকতা। এখানে রাজার লোক-লস্কর যারা আছে তারা অপেক্ষা করতে ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা কিছু লোক এখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা করাকে কর্তব্য হিসেবে নিয়েছি। আমরা যারা সম-মনা লোক আছি তাদের অনেকে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলছি। হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খাচ্ছি। আমরা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমালেও তাতে দুঃস্বপ্নেরা হানা দেয়। প্রত্যেকের ঘরে তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখন বাতিতে তেমন আলো হয় না। ঐ দেখুন, আমাদের ঘরগুলোর বাইরের দিকটা বেশ তকতকে ফর্সা। কিন্তু তাতে কী হবে? ভেতরে ঘুণ ধ’রে গেছে। এমন ঘুণ যা তিনি না আসা পর্যন্ত মেরামতযোগ্য নয়। আমাদের চেতারায়

তেল থাকলেও মাথায় মগজ নেই, নিঃশ্বাসে সুগন্ধি নেই, মনের মধ্যে ঝুলকালি। অনেকের মাথায় পচন ধরেছে অথচ খাচ্ছে কেবল অ্যাসপিরিন। আমাদের মুরগিগুলো বড় বড় ডিম পাড়লেও কুসুমগুলো ছোট। বাচ্চারা প্রেম করতে শেখার আগেই পাপ করতে শিখছে।'

'কিন্তু কার জন্য এই অপেক্ষা?'

'তা আমরা কেউ জানি না। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্যকে পালন করছি। আমাদের কাছে অপেক্ষাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' —একটু থেমে—'হয়তো অপেক্ষা আন্তরিক হচ্ছে না। অপেক্ষা আন্তরিক হলে নিশ্চয়ই তিনি সময়মতো চ'লে আসবেন।'

'এ যে দেখছি *ওয়েটিং অর গোডো*'—বলল বুড্ডা।

লোকটা বুড্ডার দিকে আরেকবার ভালোভাবে তাকাল। কী যেন ভেবে ব'লে উঠল—'আপনি তো ভাই শুধু ভালোবাসা নয়, সম্মানও পাবার উপযুক্ত।'

'মানে? তাহলে আপনারা কি যাকে ভালোবাসেন তাকে সম্মান করেন না?'

'আমাদের সমাজে এই সমস্যাটা ইদানিং বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমান রাজাকে সবাই ভয় করে, যদিও কেউ ভালোবাসে না। কিন্তু ভয়ের সাথে সম্মান জড়িত। ফলে রাজা ও তার লোকের সম্মান পাচ্ছে। কিন্তু আমরা যাদেরকে ভালোবাসছি তাদেরকে আর সম্মান করার সুযোগ পাচ্ছি না। সম্মানের সাথে ভয় জড়িত। বর্তমান রাজাকে আমরা এত বেশি ভয় পাচ্ছি যে যাকে ভালোবাসি তার জন্য আর কোনো ভয় অবশিষ্ট থাকছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে দেখবেন আমাদের লোকেরা প্রিয়জনকে কত ভালোবাসে অথচ সম্মোধন করে কিভাবে। এখানে ভাগ্নে মামাকে দূর থেকে দেখে এত খুশি হয় যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে ডাক দেয়—'হে শুয়োরের বাচ্চা মামু! কেমন আছিস?'—শুধু তাই নয়, এখানে যে যাকে যত বেশি ভালোবাসে তাকে তত অকথ্য ভাষায় গাল দেয়। মানুষ উন্নত টুথপেস্ট ব্যবহার করলেও তাদের জিহ্বা প'চে যাচ্ছে। এখানকার কিছু গবেষকও এ নিয়ে গবেষণা করছে, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আসতে পারেনি। আমি মনে করি যে অতশত তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে একথাই চূড়ান্ত যে, ***ভালোবাসার পাত্রকে যদি সম্মানও না দেয়া হয় তাহলে সেই লাগামহীন ভালোবাসাবাসি***

*অশ্লীলতার জন্য দেয়।* পশ্চিমা বিশ্বে একারণেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

'আপনিই তো আমার চেয়ে বেশি সম্মান পাবার উপযুক্ত। কারণ আমার চেয়ে আপনার জ্ঞানই বেশি।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না। তবু ভাই, শুনুন। আপনি যে *ওয়েটিং ফর গোডো-র* কথা বলছেন তা তেমন আহা-মরি কোনো ধারণা নয়। শ্যামুয়েল বেকেট তার এই আধ ঘন্টার নাটকের জন্য নোবেল পেয়েছিলেন কারণ নোবেল কমিটি ভেবেছিল যে গোডোর জন্য অপেক্ষা করা, এবং অপেক্ষারই মধ্যে গোডোরই কথা ভুলে যাওয়া—এটা একটা নতুন ধারণা। মানবজীবনটা একটা বড় অপেক্ষা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না তারা কার জন্য অপেক্ষা করছে। ফলে হচ্ছে কি, তারা শুধু অপেক্ষাই করছে। এক পর্যায়ে অপেক্ষার মধ্যে থাকছে না কোনো শৃঙ্খলা, কোনো অর্থ। আইডিয়াটা চমৎকার বটে, কিন্তু নতুন নয় আদৌ। গোটা মুসলিম সেই চৌদ্দশ বছর ধ'রে অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয় ইমাম মাহদী বা পথপ্রাপ্ত নেতার জন্য। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীও নিজ নিজ সময়ের গণ্ডির মধ্যে তাদের নিজ নিজ নেতার জন্য অপেক্ষা করেছে এবং করছেও। এঁরাই তো মাহদী। শেষ জামানায় সারা বিশ্বকে একত্রিত করার জন্য যিনি আসবেন, তিনি হবেন বিশেষ মাহদী। কিন্তু মাহদী তো প্রতি যুগের জন্য, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য। এ যেন কতকটা শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র মতো। আধ্যাত্মিক স্তরে ঘটনা একই যদিও বাইরে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন (৪:১৫২) নং আয়াতে একথা বলা হয়েছে—আল্লাহ বলেছেন যে যুগে যুগে তিনি যত নবী পাঠিয়েছেন তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না, অর্থাৎ আত্মিক বিচারে তাঁদের সবার 'আমি' এক ও অভিন্ন! শুধু তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। যতদিন এই প্রকাশের আবশ্যকতা এবং পূর্ববিধান থাকবে, ততদিন অন্তবর্তী জনগোষ্ঠীকে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নবীর জন্য। এই অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী, কারণ আসবার প্রতিশ্রুতি সত্য। তবুও মানুষ তার অপেক্ষার শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে। সৃষ্টি হয় অর্থহীনতার। ওয়েটিং ফর গোডো-র ঘটনা কাল্পনিক, কিন্তু ইসলামের ঘটনা বাস্তব। নোবেল কমিটির উচিৎ ছিল পুরস্কারটা ইসলাম ধর্মকে দেয়া।'

'আপনি তো ভাই চমৎকার কথা বলতে পারেন।'

'এখনও চিন্তাই করতে শিখলাম না। কথা বলব কিভাবে?'

'কেমন?'

‘কেউ ভালোভাবে চিন্তা করতে পারলে তার চিন্তার ঐক্য-প্রবণ শক্তি দ্বারা অন্যদের এলোপাথাড়ি চিন্তাও শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা যাঁর জন্য অপেক্ষা করছি তাঁর আছে সেই ক্ষমতা।’

‘তিনি এখন কোথায়?’

‘আমাদের অপেক্ষার মধ্যে।’

বুড্ডা হঠাৎ যেন তার কথার মধ্যে একটা ধারাল আলোর ফলা দেখতে পেল। সে বলল—‘এতদূর যখন বুঝতে পেরেছেন, তাহলে যাঁর আসবার কথা তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ধন্য হোক আপনাদের অপেক্ষা।’ —এই ব’লে সে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ী নির্জনে চলে গেল।

গভীর নির্জনে গিয়ে সে একাকী মনে বলতে লাগল—প্রভূ গো! তুমি সূরা ইয়াসীনে বলেছ-‘খায়িার রহমানা বিল গ্বাইব’—যারা না দেখে দয়াময়কে ভয় করে। হ্যাঁ প্রভু, তারাই বিশ্বাসী। তাহলে তো বিশ্বাসীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুব কম। অধিকাংশ বিশ্বাসীই তো তোমার এই কথার মর্ম বুঝল না। তুমি বলেছ, **‘দয়াময়কে’** ভয় করতে। তারা কি একবারও ভেবে দেখে যে, যিনি **দয়াময়** তাঁকে আবার **ভয়** করার কী দরকার? কেন দরকার? যিনি দয়াময় তাঁর সাথে তো সবার সম্পর্ক প্রেমের, পাপ ও ক্ষমার, দুষ্টুমি ও প্রশ্রয়ের। তবুও তাঁকে কেন ভয় করতে হবে? কারণ, **ভয়ের আবরণ মর্যাদার পোষাকস্বরূপ হয়। প্রেমিককে সম্মান করতে না পারলে সে প্রেমই তো বিশৃঙ্খলা ঘটায়।** তখন ethics ব’লে কিছু থাকে না। যা সংযুক্ত রাখার কথা তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর যা বিচ্ছিন্ন থাকবার কথা তা সংযুক্ত হয়ে পড়ে। তখন পুরুষের চোখ যায় পরস্ত্রীর দিকে, নারী চায় অন্যের স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে যেসব ক্ষেত্রে ***প্রকৃতিক বিচ্ছিন্নতা*** তুমি আগে থেকেই সৃষ্টি ক’রে রেখেছ, তা যুক্ত হয়ে পড়ে, অথচ স্বামী-স্ত্রীকে যদিও তুমি সংযুক্ত ক’রে রেখেছ, তা হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। ফলে কেউই সংসারে সুখ পায় না। যৌনতায় তৃপ্তি পায় না। যে নারী-পুরুষের পরস্পরের সাথে প্রেমপূর্ণ আঠার মতো লেগে থাকার কথা ছিল, তারা পরস্পরের মধ্যে তখন আর কিছুই খুঁজে পায় না। এ ব্যাপারে তুমিই তো পাক কালামে বলেছ:

[ওরাই বিবাদকারী] যারা আল্লাহ্ যা যুক্ত রাখতে বলেছেন তা বিচ্ছিন্ন করে এবং....গণ্ডোগোল সৃষ্টি করে। ওরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

(২: ২৭)

হে প্রভু! সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, দৈহিক, মানসিক যাবতীয় সম্পর্কই তো তোমার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চুক্তি বা সম্পর্ক। এখানে সবার প্রেম তথা ভক্তির সম্পর্ক যেভাবে গ'ড়ে উঠবে, পরকালে তো সেই অনুযায়ী সবাই সঠিক ঐক্যের টানের ভারসাম্যকে রক্ষা করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেঃ

> স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি সবাইকে **একত্র** করব [মহা-ঐক্যের ভারসাম্যপূর্ণ সমতলে], তারপর যারা শিরক করত [সঠিক ঐক্যকে স্বীকার না ক'রে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র **অনুসারে সম্পর্ক** প্রতিষ্ঠা করত] তাদেরকে বলবঃ তোমারা এবং তোমাদের শরীকরা [মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুরা] নিজ নিজ স্থানে স্থির থাক [কারণ তোমরা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত রচনা করেছ, বিচ্ছিন্নবাদীর মতো আচরণ করেছ]। অতঃপর আমি তাদেরকে পরস্পর **বিচ্ছিন্ন** ক'রে দেব। তাদের শরীকরা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না [কারণ আমরা নিজেদেরকে কেন্দ্র ব'লে কখনও দাবি করিনি; তাছাড়া মানুষের হৃদয়ের যে নিবেদন দূরকে লক্ষ্য ক'রে উত্থিত হয়, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো সঠিক কেন্দ্র, আমরা নই]। বস্তুত, আল্লাহ্-ই আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। সেখানে তারা যাচাই ক'রে নেবে নিজ নিজ কৃত কাজ [বস্তুজগৎ ও তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন] এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক [মহাকেন্দ্র] আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, আর তাদের কাছ থেকে বিলীন হয়ে যাবে তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা [কারণ একটি বৃত্তের কেন্দ্র তো হতে পারে কেবল একটিই—গোটা দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্টিজগৎ মিলে একটিই বৃত্ত]।
>
> (১০: ২৮-৩০)

এই রহস্য মানুষ বুঝল না। ফলে **মানুষ এখন আনন্দিত হয়েও পাপ করে, পাপ ক'রেও আনন্দ পায়।** রেগে গিয়েও আনন্দিত হবার মুহূর্তের আচরণ প্রকাশ করে—পারভার্শান বা বিকৃতি। তোমার মনোবিজ্ঞানীগণও পারভার্শনের মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞাটা জানেনি, যদিও তুমি কোরআনে তা বলেছ বড় স্পষ্ট ক'রে—'ওদের খারাপ কাজকে ইবলিস ওদের কাছে মোহনীয় ক'রে দেখায়, তারপরও ওরা মনে করে যে ওরা ঠিক কাজ করছে।'

**তোমার সংজ্ঞায় পারভার্শান হলো শুধু বিকৃতি নয়, বিকৃতিতে আনন্দ পাওয়া এবং সেই বিকৃত মন দ্বারা 'আনন্দ শব্দটাকেই ব্যাখ্যা করা, আনন্দের সংজ্ঞা বাতলে দেয়া।** প্রভু গো, তোমার মানুষ বিকৃতির মধ্যে আনন্দ পাচ্ছে। এখন মানুষ মানুষকে গাল দেয় প্রিয়তম মায়ের প্রসঙ্গ তুলে। মানুষ লজ্জার পোষাক ত্যাগ করার পর ভুলে যাচ্ছে যে, **লজ্জাহীন প্রেমই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক।** রসূল (সঃ) কে দিয়ে তুমি বলিয়েছ যে লজ্জা ইমানের অঙ্গ। এমনকি স্বামী-স্ত্রীকেও মিলিত হতে বলেছ পর্দার আড়ালে। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারছে না। তুমি পাক কালামে মা-বাবা আদম-হাওয়া (আঃ) এর লজ্জার বস্ত্রহরণের এবং পুনরায় বস্ত্রাবৃতিকরণের ঘটনাও সুন্দরতম ভাষায় বলেছ, কিন্তু তবুও কেউ তারা মর্ম বুঝতে পারছে না:

হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা উভয়ে সেখানে যা ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ গাছের কাছে যেও না, গেলে তোমরা অত্যাচারিদের (জালিম) অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ ক'রে দেয় যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বলল: তোমাদের রব তোমাদের এ গাছ থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যেন তোমরা ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে না যাও। আর সে তাদের উভয়ের সামনে কসম ক'রে বলল: আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গলকামীদের একজন। এভাবে সে তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে গাছের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে নগ্ন হয়ে গেল এবং তারা বেহেশতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের **প্রকাশ্য শত্রু?** তারা উভয় বলল: হে আমাদের রব! আমরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ব। তিনি বললেন: তোমরা নেমে যাও, **তোমরা একে অপরের শত্রু।** তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বাসস্থান কিছুকালের জন্য জীবিকা। তিনি বললেন: সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের ক'রে আনা হবে। হে আদম সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য **পোশাক** সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের **লজ্জাস্থানকেও** আবৃত করে, এবং বেশি-ভূষার (সৌন্দর্যের উপকরণও হয়; এবং **খোদা-ভীতির পোশাক,** এটাই সর্বোত্তম।

(৭:১৯-২৬)

মানুষ প্রবল আনন্দ নিয়ে পাপ করছে, অথচ মুখে বলছে যে দয়াময় আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। অথচ দয়াময় নিজেই যে বলেছেন যে **তিনি দয়াময় বলেই তাঁকে ভয় করতে হবে,** তা তারা ভুলে যাচ্ছে। এখন তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতেই এক বিশ্বাসী আরেক বিশ্বাসীকে খুন ক'রে কাফের হয়ে মরছে। এর ফলে কী হচ্ছে সব তোমার জানা। মানুষ অযোগ্যকে ভয় করছে, বাহ্যিকভাবে সম্মান করছে। তোমার হাবিব (সঃ) তো তাই বলেছিলেন—শেষ জামানায় মানুষ অযোগ্যকে ভয় ও সম্মান করবে, কারণ তারাই হবে তাদের নেতা। প্রভু গো! এখন হয়তো বা সেই জামানাই চলছে। সব আলামত প্রকাশিত। তাই যদি হয়, তাহলে তুমি প্রিয় নেতাকে মঞ্চে উঠে আসার জন্য আদেশ দাও।' এই ব'লে সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

নয়

## মৃত্যুর প্রস্তুতি

পরদিন সকালে ফজরের নামাজ শেষে বুড্ডা গুরুজীর উপদেশ মোতাবেক কমপক্ষে দুই ঘন্টা মনটাকে ঠিক এই মুহূর্তে বর্তমানে আনার চেষ্টা করল। এর আগে রাতেও সে অনেক্ষণ ধ'রে অনুশীলন করেছে। কিন্তু তার সাধনায় কিছুটা অগ্রগতি হয় এবং কিছুটা অবনতিও হয়। সে যারপরনাই হতাশ হলো। অবশেষে সকালের নাস্তার পর চুপচাপ গুরুজীর পাশে গিয়ে বসল। গুরুজী বললেন—'তোমাকে ডাকিনি।'

'না ডাকতেই এলাম, গুরুজী। এটাই আপনার বেশি পছন্দ। যেমন মূসা (আঃ) একটু তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন'—

'হে আমার রব! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এলাম, যেন আপনি খুশি হন। (সূরা ত্বা-হাঃ ৮৪)"

'তোমার মুখে পেরেশানির ছাপ। কিসে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে?'

'মনটা।'

'ওকে আমার কাছে ধ'রে আন। ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

'কিন্তু ধরতে গেলে তো পাই না। হারিয়ে যায়।'

'তার মানে ও তোমার কল্পনা। ও আসলেই নেই। যা নেই তাকে তুমি সারাজীবন খুব বেশি যত্ন ক'রে লালন-পালন করেছ, সে তোমাকে যে পথে চালিয়েছে সেই পথে চলেছ, যা করতে ও ভাবতে বলেছে তাই করেছ আর ভেবেছ। এ কারণে তোমার কর্মগুলো, ভালোবাসাগুলো, সদিচ্ছাগুলো, শক্তিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র বাণী শোনোনি?

বস্তুত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ **করি,** পরে সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের **ঘন** সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তুরা খেয়ে থাকে। তারপর জমিন তার **মনোমুগ্ধকর দৃশ্য** ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে ওঠে আর **জমিনের মালিকের ধারণা করে যে তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে;** তখন এসে পড়ল তার ওপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে, ফলে আমি তা এমন **নিশ্চিহ্ন** ক'রে দিলাম যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপই আমি বিশদভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করি **চিন্তাশীল লোকদের জন্য। (১০: ২৪)**

তুমি কি চিন্তাশীল লোক? ধ'রে নিলাম তুমি তাই। হৃদয়টা তোমার জমিন। তোমার আশা-আকাঙ্খা ধারণা চিন্তা কল্পনা এগুলো হলো ফসল। আল্লাহ্‌র যখন রহমত নাযিল হয়, তহখন তোমার আশা-ভরসা স্বপ্নগুলো তরতর ক'রে জেগে ওঠে। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তোমার মনে মঞ্চায়িত করে

সপ্ত-রঙা নাটক। তুমি ভেবে বস যে তুমি বুঝি সুখের সুখের উৎসের মালিক হয়ে গেছ। কিন্তু হঠাৎ এক দুঃখের ঝড়ো বাতাস এসে মুহূর্তের মধ্যে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিল। তুমি খুঁজতে গিয়ে আর পেলে না কোথায় সুখ।

এ একটা উপমা। পার্থিব জীবনের বস্তুগত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মিথ্যার ওপর ভরসা করলে এমনও এক সময় আসবে যখন তার ভিতের ওপর দণ্ডায়মান ইমারতকে আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। কোথায় তোমার বহু-রঙা মন? খুঁজতে গেলে তা উধাও। তুমি শুধু এটুকু বলতে পার—'আমি **ওটা** চাই'—এভাবে তুমি কেবল 'ওটা' কে অর্থাৎ বস্তুকে দেখতে পার, কিন্তু তুমি কখনও দেখাতে পার না ***কে*** তা চায়।

তারা এ পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার উদাহরণ ঐ বায়ুর মতো যাতে রয়েছে প্রচণ্ড হিম, যা আঘাত করল এমন লোকদের শস্যক্ষেত্রকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, ফলে সে বায়ু শস্যক্ষেত্রটি ধ্বংস ক'রে দিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করেননি, বরং তারাই নিজেদের ওপর অবিচার করেছে।

(৩: ১১৭)

কী ব্যয় কর তুমি পার্থিব জীবনে? তোমার ইচ্ছাশক্তি—অর্থাৎ আবেগের এনার্জি, আশা-আকাঙ্খা—কিংবা তা দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ। প্রথম ক্ষেত্রটাই বিবেচনা করা যাক। বাতাসের মতো ধাবমান এবং শক্তিশালী এইসব আবেগের শক্তিগুলোকে তুমি এমনভাবে অপরিকল্পিতভাবে অপচয় কর যে তার আঘাতে তোমার শস্য অর্থাৎ অর্জিত যোগ্যতা ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিষ্ফল হয়ে যায়। এ জন্য তুমি সেগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে আর খুঁজে পাও না।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে [অর্থাৎ তার নিয়তকে সঠিক ঐক্যের দিকে না রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এবং এভাবে ইচ্ছাশক্তির অপচয় করে] সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল [তার অস্তিত্ব আর একটি ভারসাম্যের সুতোয় বাঁধা রইল না]। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

(২২:৩১)

তোমার মনকে তুমি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছ। এখন তোমার দায়িত্বটা হলো মনটাকে এনে আমার হাতে তুলে দেয়া! বাকি দায়িত্ব আমার।

'কিন্তু খুঁজতে গেলে যে ওকে আর পাওয়া যায় না।'

'তাহলে ওকে খুঁজতে যেয়ো না। দেখবে যে ও নিজেই এসে তোমার হাতে ধরা দেবে।'

'কিভাবে?'

'আল্লাহ্‌র কাছে বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রার্থনা কর:

প্রভু গো! মৃত্যু দাও।

মৃত্যু দাও!

মৃত্যু দাও!

হঠাৎ ক'রে মৃত্যু দাও!

মৃত্যু দাও আমার কুপ্রবৃত্তির।

মৃত্যু দাও আমার লোভ-লালসার।

মৃত্যু দাও আমার অতীতপ্রীতির।

মৃত্যু দাও আমার মনের ভবিষ্যদ্‌গামিতার, অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎ-মুখী আশা-আকাঙ্খার।

মৃত্যু দাওয় আমার হিংসার।

মৃত্যু দাও আমার বেয়াদবির।

মৃত্যু দাও আমার স্বাধীনতার।

মৃত্যু দাও আমার গাফিলতির।

মৃত্যু দাও আমার টেনশন ও উদ্বেগের।

মৃত্যু দাও আমার হতাশার।

মৃত্যু দাও আমার অহংকারের।

মৃত্যু দাও আমার স্বার্থপর ক্রোধের।

মৃত্যু দাও আমার অস্থিরতার।

আমার রিয়ার বা লোক-দেখানো ইবাদতের ইচ্ছার মৃত্যু দাও।

তারপর মনকে ধরার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ফাঁদটা পাত।'

‘কী ফাঁদ, গুরুজী?’

মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ফাঁদ!

‘কী ফাঁদ, গুরুজী?’

ইহকাল পরকালের শ্রেষ্ঠতম ফাঁদ।’

‘কী ফাঁদ, গুরুজী?’

গুরুজী বুড্ডার দিকে তাকিয়ে চুপ ক’রে রইলেন। বুড্ডা গুরুজীর দিকে তাকিয়ে চুপ ক’রে রইল। কিছুক্ষণ পর বুড্ডা বলল—‘কী ফাঁদ, গুরুজী?’

গুরুজী বুড্ডার দিকে তাকিয়ে চুপ ক’রে রইলেন। বুড্ডাও গুরুজীর দিকে তাকিয়ে চুপ ক’রে রইল। খানিক্ষণ পর সে আবারও প্রশ্ন করল—‘কী ফাঁদ, গুরুজী?’

গুরুজী তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—‘জগতের খুব কম লোকই তা পেরেছেন। তুমি তা পারবে ব’লে মনে হয় না।’

বুড্ডা গুরুজীর দিকে আঠালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—‘কী ফাঁদ, গুরুজী।’

গুরুজী মুখটা উল্টোদিকে ঘোরানো রেখেই মন্তব্য করলেন—‘কঠিন ফাঁদ। নিজে ধরা পড়ার ভয়ে কেউ তা পাতে না।’

‘খুব কঠিন কি?’

‘মাত্র একটা শব্দ।’

‘জানার জন্য জীবন দিতে ইচ্ছে করছে।’

‘মাত্র একটা শব্দ।’

‘জীবনের বিনিময়ে জানতে ইচ্ছে করছে।’

‘একটা মাত্র শব্দ।’

‘কঠিন কি?’

‘একটা মাত্র শব্দ।’

‘প্রাণটা না-রাখাকে পছন্দ করছি।’ ]

‘সবাই দিনে শতশত বার উচ্চারণ ক’রে থাকে। কয়েকজন বাদে কারোরই উচ্চারণ সঠিক হয় না।’

‘কী সেই মহামূল্যবান শব্দটা, গুরুজী?’

**‘আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌!’**

‘আমি তো এর সঠিক উচ্চারণ জানি।’

‘আল্লাহ্‌র রাজ্যে দুটো মাত্র শব্দ আছে যেগুলোর কোনো মৌখিক উচ্চারণ নেই। তাদের একমাত্র উচ্চারণ হৃদয়ে। একটা হলো ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ আরেকটা ‘আলহামদুলিল্লাহ।’

‘হৃদয় দিয়ে শুনতে চাই।’

‘উচ্চারণটা ভয়ংকর।’

‘যেমন?’

‘যারা এর ভেতরের উচ্চারণ জানে না এবং কেবল বাইরের উচ্চারণ নিয়ে মাতামাতি করে তারা সাপ নিয়ে খেলা করে।’

‘কিভাবে?’

‘তখন তার নাম হয় মোনাফেকি।’

‘বুঝতে না পারা পর্যন্ত মরতেও শান্তি পাব না।’

‘আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌!!!’

‘শব্দটা নয়, উচ্চারণটা বলুন।’

‘বলা যায় না।’

‘তাহলে কি কোনো আশা নেই?’

‘সবাই পারে না।’

‘এ জন্যেই সঠিক উচ্চারণটা শেখার জন্য পৃথিবীর সবকিছু ত্যাগ করব।’

‘পৃথিবীর কোনো কিছুই তোমার নয়। তাছাড়া তার কোনো দরকারও নেই। শুধু মনটা ত্যাগ করলেই হলো।’

'ওটাই তো সমস্যা।'

'কৌশল ব'লে দিচ্ছি। চুপচাপ বসবে। যেভাবে সুবিধা বোধ কর। তারপর হালকা শব্দ ক'রে চোখ বুজে বলবে:

—এই মুহূর্তে আমার যা আছে তা নিয়ে আমি আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ্!

—এই মুহূর্তে আমার যা নেই তার জন্য আমি আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ!

—আমি সারা জীবন যা পেয়েছি তার জন্য আমি আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ!

—আমি সারা জীবন যা চেয়েও পাইনি তার জন্য আমি আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ্!

—আমি এত আনন্দিত যে ঠিক এই মুহূর্তে আমার কোনো অতীত স্মৃতিরও দরকার নেই। আমি বর্তমান মুহূর্তটিতেই আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ!

—আমি এত বেশি আনন্দিত যে ঠিক এই মুহূর্তে ব'সে আমার আর ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আল'হামদুলিল্লাহ!

—আমি যত কষ্ট পেয়েছি, অবহেলিত হয়েছি, নির্যাতিত হয়েছি তার জন্য আমি আনন্দিত। ***আমার কোনো আফসোস নেই।*** আল'হামদুলিল্লাহ!

—আমার কোনো আক্ষেপ নেই। অপূর্ণ বাসনা নেই। যদি কোনো বাসনা অপূর্ণ থেকে থাকে তাহলে তার জন্য আমি বেশি আনন্দিত। আল'হামদুলিল্লাহ্!

এবার জীবনের সব ঘটনাগুলো একে একে স্মরণ কর যেগুলো তোমার কষ্টের কারণ। এবং প্রতি ক্ষেত্রে শব্দটাকে উচ্চারণ কর। প্রতি ক্ষেত্রেই! যেসব কারণে তোমার আফসোস রয়ে গেছে সেগুলো স্মরণ কর এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে বল—আল'হামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি আমার কর্মফল হিসেবে হোক আর পরীক্ষা হিসেবে হোক, যখন যে কষ্ট

দিয়েছেন বঞ্চনা দিয়েছেন অবহেলা দিয়েছেন—তার সবকিছুর জন্য প্রশংসিত। তিনি কখনও জুলুম করেন না। তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এই ব'লে মনকে অতীত ভবিষ্যতের কল থেকে ঠিক এই মুহূর্তে এনে চুপ ক'রে বসে থাক। যদি মনটা স্থির, বিদ্রোহহীন, রাজি-খুশি থাকে, তাহলে যে-বোধের সৃষ্টি হবে তাই হলো 'আলহামদুলিল্লাহ্' শব্দটার আসল উচ্চারণ।

আল'হামদুলিল্লাহ্ বলব শুধু আল্লাহ্‌র রহমত পেলে, অন্য ক্ষেত্রে নয়—তাহলে তার মানে কী দাঁড়ায়? তার মানে কী এরকম হয়ে যায় না যে 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তবে শর্তসাপেক্ষে। তিনি যদি আমার ভালো করেন তাহলে তিনি প্রশংসিত, নইলে নয়।' সাবধান! এরূপ শর্তসাপেক্ষে প্রশংসা হলো মোনাফেকি। মোনাফেক কাফেরের চেয়েও অধম। কপাল ভালো যে এ হলো অন্তরের মোনোফেকি, যার কারণে শরীয়তের বিচারে তা ধরা হয় না। এজন্য আল্লাহ্ তার হিসেব নিজেই নেবেন পরকালে এবং ইহকালে। আল্লাহ্ যদি তা গোপন না করতেন তাহলে আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের অনেকেরই গোপন মোনাফেকি প্রকাশ ক'রে দিতাম। মনে রাখবে, ***আল্লাহ্‌র প্রশংসার সাথে নিঃশর্তভাবে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হওয়ার শর্ত জড়িত। যে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট নয়, সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে পারে না।*** আমি আনন্দিত হওয়ার যে ক্ষেত্রগুলোর কথা বলেছি তার সবই পবিত্র কোরআনে আছে। আমি তোমাকে একটা একটা ক'রে আয়াত তুলে দেখাতে পারি। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বলে তা আর করছি না। এস. এম. জাকির হুসাইনের *ধ্যানের শক্তি এবং নবজীবন* বইটা প'ড়ে নিয়ো।

এবার মনে মনে নিয়ত কর—আমি এই মুহূর্তেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এই প্রস্তুতির কথা আল্লাহ্ কোরআনে সুন্দরতম এবং সংক্ষিপ্ত ভঙ্গিমায় বলেছেন:

> হে যারা বিশ্বাস করেছ! তোমরা **ধৈর্য ধারণ** কর এবং ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর আর ***সর্বদা প্রস্তুত থাক*** [শত্রুর বিরুদ্ধে কিংবা মৃত্যুর জন্য কিংবা যে-কোনো কোরবানির জন্য] আর আল্লাহকে **ভয় কর** যেন তোমরা **সফলকাম হতে পার**।
>
> (৩:২০০)

ধৈর্য তোমার প্রস্তুতির সচেতনতাকে স্থির রাখবে, প্রস্তুতির সচেতনতা তোমাকে মৃত্যুভয় ও হতাশা ও একাকিত্ববোধ এবং অসহায়ত্ববোধ দান করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র একত্বকে হারাবার ভয় তোমার সেই ক্ষুদ্র ভয়কে বারবার ঠেকিয়ে দিয়ে ধৈর্যধারণকে তোমার জন্য সহজ ক'রে দেবে। *আল্লাহ্‌র চেয়ে যেন মৃত্যুকে বেশি ভয় না পাই!*—এই ভয়ই এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ভয়।

এভাবে একটা ক্রমাগত কম্পনের ধারা তোমাকে সফলতার দিকে চালিত করবে। মৃত্যুভয় যত বেশি হবে তত লাভ, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ্‌র ভয় দ্বারা তাকে উল্টো ধাক্কা দিতে হবে, যেন এক পর্যায়ে মৃত্যুভয় নিজেই ম'রে যায় এবং তুমি নবজীবন লাভ কর। এটাই হলো আল্লাহর পথে প্রকৃত লড়াই:

> তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে বললেন: **মরে যাও। পরে তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন**। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি দয়াশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া জানায় না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে **লড়াই কর** এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তারপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রসারিত করেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।
>
> (২: ২৪৩-২৪৫)

আয়াতগুলোর মর্মার্থকে এভাবেও দেখতে পার: যাদের মন ভালো কিন্তু মৃত্যুভয়ের কারণে দুঃসাহসী কাজ করতে পারে না, তাদেরকে আল্লাহ্‌ বিশেষ ক্ষেত্র সৃষ্টি ক'রে ভয় দিয়ে ঘর থেকে বের করবেন, এবং এক পর্যায়ে ভয়হীন করে দেবেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন গৌতম বুদ্ধকে, ইব্রবরাহিম বিন আদাম (রহঃ) সহ অন্যান্য অনেককে। সুতরাং ভয় বেশি থাকলে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর প্রচুর ভয় পাবার মাধ্যমে। হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে এই কাজে বিনিয়োগ কর। প্রথমত মৃত্যুর পর তুমি যে নবজীবন লাভ করবে, তারপরই তুমি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করতে পারবে। তার আগ পর্যন্ত ভয় পাওয়া ফরজ। আল্লাহ্‌ ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে তোমাকে তাঁরই দিকে টেনে নেবেন। ভাববে—**এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যুই হয়, তাহলে বিগত জীবনের জন্য আর কিসের আফসোস? মৃত্যুকে পেয়ে আমি আনন্দিত হব কি না তা আমি জানি না, তবে বিগত জীবনে আমি যা পেয়েছি এবং পাইনি তা নিয়ে আনন্দিত। নতুন আশা-আকাঙ্খাও আমার নেই। বল—মৃত্যুর সময়ে আমি আল্লাহ্‌র ওপর খুশি থাকব না তা কি ক'রে হয়?** তা না হলে কি তিনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন? আল'হাম্‌দুলিল্লাহ্‌!—এবার চেষ্টা কর এবং দেখ কী ঘটে।'

বুড্ডা সাধনায় লেগে গেল। আধ ঘন্টা পর বড় এক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—'গুরুজী, মন এখন আমাকে নিয়ে দূরে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে না, ও আমাকে ঠিক এই মুহূর্তে এসে চারদিক থেকে আক্রমণ করছে। গুরুজী, **নিঃশর্তভাবে আনন্দিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার! এ কারণে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করাও সত্যিকার অর্থে সবার দ্বারা সম্ভব না।'**

‘কিন্তু জেনে অবাক হবে যে **মুক্তি এবং তোমার মধ্যকার দূরত্ব হলো তোমার আফসোস আর আনন্দিত হওয়ার দূরত্বটুকু মাত্র**। যুগ যুগ ক’রে কঠোর সাধনার পর যারা উদ্দেশ্য হাসিল করেন, তারা এটুকু রহস্য জানতে পেরে অবাক হয়ে যান মুক্তির সব রহস্য এই একটামাত্র শব্দের মধ্যে লুকানো রয়েছে। মাত্র এই শব্দটার মধ্যে। মানবজীবনের জন্য এর বাইরে অন্য কোনো রহস্য নেই। সুতরাং মনকে সন্তুষ্ট কর। এই সামান্য মনের ময়লাটুকু পার হতে পারলে তুমি তাই জানবে যা কোনো মানব জানেনি, তাই দেখবে যা কোনো মানব চোখ দেখেনি, তাই পাবে যা কোনো মানব আকাঙ্খা পায়নি। চেষ্টা কর। আগামীকার সকালে আমাকে বলবে কী ঘটেছিল। মনে রাখবে **আমি যা করতে বললাম তার মধ্যে মুক্তি রয়েছে কি না তার প্রমাণ হলো তা কঠিন কি না তার মধ্যে**। যেহেতু তোমার কাছে জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ ব’লে মনে হচ্ছে মনটাকে কোনো ধারণা, চিন্তা, আফসোস, কল্পনা, আকাঙ্খা ছাড়া ঠিক এই মুহূর্তে ধ’রে রাখাকে, সেহেতু এটাই প্রমাণ করছে যে এর মধ্যেই রয়েছে সেই বস্তু যা তুমি চাচ্ছ। মনে রাখবে, বর্তমানের স্থির মুহূর্তটা এমন এক জগৎ যার কোনো সীমা নেই, যা এমনকি মৃত্যুর কবল থেকেও মুক্ত। একমাত্র আল্লাহ্ই চিরবর্তমান। সুতরাং এখানে তুমি তাঁরই দেখা পাবে। এবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর।’

দশ

## উত্তপ্ত আলো

বুড্ডার এখন একমাত্র ধ্যান, একমাত্র কামনা কিভাবে গুরুজীর নির্দেশিত পথে ঠিক এই মুহূর্তে অবস্থান ক'রে মাত্র একটিবার *আল্'হামদুলিল্লাহ্* বলা যায়। কিন্তু সে দেখল যে সে এ ব্যাপারে মনের ওপর যত জোর প্রয়োগ করতে যায়, তত তার মন চারদিক থেকে এসে আক্রমণ চালায়। ব্যাপারটা যেন পানিতে হঠাৎ ক'রে কোনো উপায়ে গর্ত তৈরি করার মতো—সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের পানি এসে তা পূরণ করবে। ফলত সে মনের ঠিক এই মুহূর্তে একটা মসৃণ গর্ত খুঁড়তে পারছে না। ব্যাপারটা সে গুরুজীকে না জানিয়ে নিজেই আপ্রাণ সাধনা করতে লাগল আরো কী কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, যেন সে পরে গুরুজীকে সব একসাথে বলতে পারে। তা ছাড়া সে আপাতত গুরুজীর কাছে ভিড়তে চায় না। বিকালে আবার সেই পাহাড়ী গ্রামটায় একবার ঢু মারতে হবে। তাদেরকে অবস্থাটা নিয়ে রীতিমতো একটা মহাকাব্য লিখে ফেলা যায়—ভাবল সে। সুতরাং সে বিকালে যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

সে আজও সেখানে গিয়ে একই দৃশ্য দেখল। তবে আজ সে এমন কিছু বিষয় লক্ষ্য করল যা গতদিন তার চোখে পড়েনি। সে দেখল যে আজ প্রায় প্রত্যেকের সাথে এক বা একাধিক শিশুও রয়েছে। সে এক লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল যে তারা সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন যার যার ঘরের শিশু সন্তানকেও নিয়ে আসে। তবে কে কার সন্তানকে কবে আনবে তা পূর্বনির্ধারিত নয়। একই ভাবে সে কিছু মহিলাকেও দেখল। ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগল। সে মনে মনে ভাবল—পৃথিবীর প্রত্যেকা মুসলিম দেশে এরকম একটা অপেক্ষার জায়গা তৈরি করা উচিৎ। ]

বুড্ডা এক লোকের পাশে এসে বসল। আজ তার পরনে সাধারণ জামা কাপড়। গুরুজী দিয়েছেন। ফলে তার পাশের লোকটা তার দিকে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকাল না। সে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল—'গতকাল যার সাথে কথা বলেছিলাম, ওনাকে কি আজ পাওয়া যাবে?'

'যাবে, যদি তিনি সুস্থ থেকে থাকেন।'

বুড্ডা অবাক হলো। সে ইচ্ছে ক'রে প্রশ্নটাকে ওভাবে করেছিল। সে আশা করেছিল যে হয়তো জবাব আসবে—'তার আমি কী জানি? আপনিই

বা কে? গতকাল আপনি আদৌ এসেছিলেন কি না, এসে থাকলে কার সাথে দেখা করেছেন, তা আমি কিভাবে বলি বাপু?' কিন্তু সে তার জবাব থেকে বুঝতে পারল যে এখানে আসার ব্যাপারটা কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়, পুরোপুরি আগ্রহ এবং প্রেরণার ব্যাপার। জোর ক'রে মানুষকে এতটা ডিসিপ্লিন শেখানো যায় না। আমার দেশের সরকারি অফিসে আইনের জোর-জবরদস্তি থাকলেও সে-সব জায়গায় আসবাবপত্র, দরোজা, জানালা ঠিকঠাক থাকে না। কারণ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই কোনো দায়িত্ববোধ নেই। দেশের সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করার কোনো আগ্রহ নেই। **ডিসিপ্লিন একটা আগ্রহের ব্যাপার**। তা কোনো জবরদস্তির ব্যাপার নয়। সামরিক বাহনীর জোয়ানদের মধ্যে শত্রু-বিমুখী আক্রোশ জেগে ওঠে ব'লে তারা দেশকে ভালোবাসতে শেখে। আর ভালোবাসাই তাদের মধ্যে ডিসিপ্লিনের প্রেরণা দেয়। আল্লাহ্ ইবলিসকে আমাদের পেছনে চব্বিশ ঘন্টার চাকরি দিয়ে ছেড়ে রেখেছেন আমাদের প্রকাশ্যভাবে তার বিরোধিতা করতে সুযোগ দেয়ার জন্য । তার বিরোধিতা করতে করতেই সত্যকে ভালোবাসার প্রেরণা জাগবে। মনের মধ্যে ভালো হবার স্পৃহা জেগে উঠবে। কিন্তু তবুও তাতে কাজ হচ্ছে না। কেউ শত্রুকে শত্রু হিসেবে নিচ্ছে না; বরং তার সাথে বন্ধুত্ব করছে। সে আরো জানতে চাইল—'আপনারা কি প্রতিদিনই এখানে আসেন, নাকি সপ্তাহের কিছু নির্ধারিত দিন আছে?'

'আগে মাসে একদিন আসতাম। তারপর দু'সপ্তাহে একদিন। তারপর সপ্তাহে একদিন। এখন সপ্তাহে চারদিন।

'কারণ?'

'তিনি হুট ক'রে চলে আসতে পারেন।'

'কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার কী?'

'অপেক্ষা না করলে তিনি আসবেন না।'

'সে কেমন?'

'জানেন না, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তো তাই বলেছেন! গুরুজী এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক তথ্য এবং তত্ত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে বিভিন্ন জাতি তাদেরকে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর কাছে তাদের মধ্য থেকেই উত্থিত করার জন্য প্রার্থনা করেছে কিংবা নবীর কাছে কামনা করেছে:

তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাইলের নেতাদেরকে দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল: আমাদের জন্য একজন শাসক নির্ধারিত ক'রে দিন.....,।

(২:২৪৬)

রসূল (সঃ) ইমাম মাহদী আসার ব্যাপারে কী বলেছেন তা জানেন না?

আল্লাহ পৃথিবীর ধ্বংসকে ততদিন বিলম্বিত করবেন যতদিন না পর্যন্ত তিনি মাহদিকে পাঠাবেন (H.A.R Gibb এবং J.H.Kramers এর *Short Encyclopedia of Islam* দ্রঃ)।

কেন আল্লাহ্ মাহদীর আগমনকে বিলম্বিত করবেন? কেন তিনি তখন আসবেন যখন সমাজ নাফারমানিতে ছেয়ে যাবে? কারণ সমাজ নাফারমানিতে ছেয়ে গেলে তখন তাকে ঠিকঠাক করার জন্য নেতার দরকার হয়। আল্লাহ্ ঠিক এরূপ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন।

কিন্তু নবী পাঠানোর ব্যাপারটা ভিন্নভাবে পূর্বনির্ধারিত। মাহদীগণও পূর্বনির্ধারিত। তবে তাদের আগমনের প্রয়োজন এবং ক্ষেত্র ***তৈরি*** হতে হবে।

'ধরুন সমাজে অরাজকতা নাফরমানি বেড়ে গেল কিন্তু কেউ মাহদীর আগমনকে কামনা করল না। তাহলে তিনি আসবেন না।'

'না।'

'ও মাই গড! তাহলে আর পূর্বনির্ধারণের মূল্য থাকল কী?'

'রহস্য তো এখানেই! পূর্ব নির্ধারণকে কর্মপ্রবাহের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যে কারণে অধিকাংশ বিশ্বাসী চিন্তাবিদও তা বুঝতে পারে না, যদি না তাদের জ্ঞান-সাধনার সাথে খোদা-ভীতি ও বৈরাগ্য থাকে। জগতে মাহদীর কামনাকারী কেউ না থাকলে তখন আল্লাহ্ প্রথমে **এমন লোক সৃষ্টি করবেন** যারা মাহদীকে কামনা করবে:

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ্ **এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালোবাসবে।**

(৫:৫৪)

অর্থাৎ সার্বিক ভারসাম্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকাশিত মোট এনার্জিগুচ্ছ তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত, সৃষ্টি-ধ্বংস উত্থান-পতন চলতে থাকবে। আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারণের রহস্য অধিকাংশ আলেমও জানে না। তারা শুধু আছে নামাজ-রোজা নিয়ে। অথচ তাদের অনেকে ভুলে যায় যে রসূল (সঃ) বলেছেন যে কারো কারো নামাজ-রোজা ইবাদতই তাদের ধ্বংস করবে। কি বিস্ময়কর এই দেশটা। এখানো মসজিদের ইমামরা জনগণকে

মসজিদে টাকা দিতে বলে কিন্তু খুব কম ইমামই একথা জোরে সোরে ব'লে থাকেন যে মসজিদে দান করতে হবে হালাল টাকা। ফলে হয় কি, অনেকে মসজিদে বেশি বেশি টাকা দেয়ার জন্য বেশি বেশি টাকা কামাতে চায়। আর বেশি বেশি টাকা কামাতে গিয়ে তারা বেশি বেশি অর্থলোভী হয়ে পড়ে, বেশি বেশি ঘুষ খায়, ক্রেতাকে ঠকায়, সন্ত্রাসি করে, অবৈধ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। আমি নিজে এরকম লোক অনেক দেখেছি। আমেরিকা যখন ইরাককে আক্রমণ করে, আফগানিস্তান ধ্বংস করে, ফিলিস্তিনকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নির্মূল করতে চায়, তখন এখানে মিছিল করার লোক থাকে। এ একটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু দেশের মধ্যে এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ এমনকি শিশু ধর্ষণের মতো জঘণ্য ঘটনা ঘটলেও কোনোদিন একটা মিছিল বের হয় না। অন্তত টুপিওয়ালাদের তরফ থেকে তো হয়ই না। সমাজে সন্ত্রাস হলে সবাই তাকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ক'রে নিজে একটা পক্ষ নিয়ে নিজের মনের কুৎসিত গোত্রপ্রীতির প্রকাশ ঘটিয়ে দেয়। কিন্তুর সত্যের কী কোনো দল আছে, সত্য ছাড়া, মিথ্যার বিরোধিতা করা ছাড়া? হিন্দুর মেয়ে ধর্ষিতা হলে এখানে মুসলমানদেরকে কি আল্লাহ্ বিচার করবেন না ব'লে তারা মনে করে? আল্লাহ্কে খুব কম লোকই চিনেছে। আল্লাহ্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ভুল। এই জাতীয় ধার্মিকতা পরিশেষে ধোপে টেকে না। মুসলমানের বিপদে হিন্দু কখনও এগিয়ে আসবে না একথা কোরআনেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন—'তোমাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণা করে ইহুদীরা আর মূর্তিপূজারীরা'—এই জাতীয় কথা। আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন—'হে মুহম্মদ (সঃ)! তুমি ওদেরকে ভালোবাসলেও ওরা তোমাকে মনে মনে ঘৃণা করে।'—এ হলো ওদের মানসিক চরিত্র। কিন্তু মুসলমানের এই স্বভাব অবলম্বন করা সাজে না। তা তাদের জন্য হারাম। আল্লাহ্ তো এও বলেছেন—**ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর** (আয়াত ২৮:৫৪)। কিন্তু কেউ তা করছে না। সবাই প্রতিহিংসায় মত্ত। প্রতিহিংসা বলে মুসলমানের কিছু নেই—আছে কেবল ন্যায়বিচার এবং কিছু ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ, তাও ক্ষমা করতে পারলে আরো ভালো—এভাবেই কোরআনে বলা হয়েছে। আমেরিকা যখন ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের কুৎসিত হাত দিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় তখন দীর্ঘ মেয়াদে টুপিঅলারাই তাদের আগ্রহ ও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কারণ কী? কারণ এরূপ দাঙ্গাপ্রীতির ইমান আসল সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেশের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সচেতনতা সৃষ্টি করার সদিচ্ছা এবং যোগ্যতা যাদের নেই তারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে কিভাবে? আর ঐক্যহীন জনগোষ্ঠীর ইমানী শক্তি কোনো কাজে আসে না, কারণ ইমান মানেই ঐক্য,

কারণ ইমান মানে এক আল্লাহ্‌র নির্ভুল ঐক্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস। আমার সমাজে ধর্ষণ হলে তার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আমার—ধর্ষিতা হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক। হতে পারে যে নারীদের নিজস্ব আচরণই খারাপ পুরুষদের মধ্যে পশুত্ব উস্কে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে যেমন প্রচারণা ও আহবান ও আইন থাকবে, তেমনি কেউ অপরাধ ক'রে ফেললে তারও কঠোর বিচার হওয়া উচিৎ। রসূল (সঃ) বলেছেন যে সক্ষম মুসলমানদের উচিৎ মজলুম বা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে নিজের শক্তি প্রয়োগ করা, সে ইহুদী হলেও। কারণ কী? কারণ সমাজ রক্ষার দায়িত্ব মুসলমানের। মানুষ ভুল করে। যেমন করে শিশুও। সে তার ভুলের কুফল ভোগ ক'রে পথে ফিরে আসে। এভাবে মানুষ শেখে (S.M. Zakir Hussain এর *Quranic Theory of Learning* দেখে নেবেন)।

কিন্তু খারাপ কাজের কুফল কী? তার শাস্তিই তো তার কুফল। শাস্তি না থাকলে যে লোক খারাপ তার খারাপ কাজ করার ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়ই বেড়ে যেতে থাকে। একেই বলে কন্‌ডিশনিং এবং রিইন্‌ফোর্সমেন্‌ট্‌। আল্লাহ্‌ মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। গুরুজীর কাছ থেকে entropy সম্বন্ধে জেনে নেবেন।

আল্লাহ্‌ই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের জন্য অফিশিয়াল পুলিশী পাওয়ার দেয়া হয়েছে ইসলামকে। এজন্য ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাতে রক্তপাত জেহাদ ফরজ। তা না করলে মানুষের কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করবে। কিন্তু এখন জেহাদ অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংস, প্রতিহিংসা, ও প্রতিশোধের রূপ নিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে ইসলামকে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে কোনো বিশেষ গোত্রকে রক্ষা করার এবং অন্য কোনো গোত্রকে ধ্বংস করার জন্য নয়, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সমাজকে মানুষের মনের ব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য। কয়েকটা আয়াত বলি: আল্লাহ বলেছেন—তাহলে কি যারা ইমান এনেছে তাদের এই জ্ঞান জন্মেনি যে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে সবাইকে বিশ্বাসী করতে পারতেন? তবুও কি তারা অন্যকে ধর্মে আনার জন্য জবরদস্তি করবে?—ঠিক এরূপ একটা কথা। তিনি আরো বলেছেন—তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না (আয়াত ২: ২৭৯)। তিনি অবিশ্বাসীদেরকে **সৌজন্যের সাথে উপেক্ষা** করতে বা এড়িয়ে যেতে বলেছেন এবং ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন (আয়াত—সূরা মুয্‌যামমিল, ১০)। এড়িয়েও যাব, আবার সৌজন্যও দেখাব—এটা কি আসলে ধৈর্য এবং একত্বের প্রতি

ইমান ছাড়া সম্ভব? তিনি এও বলেছেন—তুমি [হে মুহাম্মদ (সঃ)] ওদেরকে এবং আমাকে ছেড়ে দাও কিছুকালের জন্য। কি চমৎকার কথা। এর অর্থ হলো—আইন হাতে তুলে নিয়ো না। আমি সবাইকে স্বাধীনতা দিয়েছি। তারা তোমার কাজে বাধা সৃষ্টি না করলে তাদের সাথে অযথা ঝগড়া করো না। এই সবগুলো বিষয়কে একত্রে বিবেচনা করলে তা থেকে কী বুঝা যায়?

এখন আমাদের আলেম সমাজ মুখে মাহদীর কথা বললেও তাদের অনেকে নিজেদেরকেই মাহদী বলে মনে করে, যদিও বাইরে তা প্রকাশ করে না। এ কারণে তাদের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট অপেক্ষার কালচার গড়ে ওঠেনি। সব ব্যাপারে তারা নিজেরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে ব'সে থাকে। এমনকি তাদের ***অনেকে এও মনে করে যে আল্লাহ্ মুসলমানের একার।*** আল্লাহ্‌র কসম, এরা আল্লাহ্‌কে চেনেনি। তারা মানুষের মধ্যে কোনো স্থিরতা এবং অপেক্ষার কালচার গ'ড়ে তুলতে পারেনি। ***এক মাত্র ক্রমাগত অপেক্ষাই পারে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে।*** কারণ তার ফলে সবার মধ্যে একটা সাধারণ বা common লক্ষ্য তৈরি হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে সর্বদা ভবিষ্যৎমুখী হয়ে থাকতে বলেছেন:

তোমরা এই জগতের ক্ষণিকের দ্রব্যসামগ্রীর দিকে তাকাও, কিন্তু আল্লাহ্ তাকান **পরকালের দিকে।**

**(সূরা আনফাল: ৬৭)**

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিৎ সে **আগামীকালের জন্য** সামনে কী পাঠিয়েছে।

(সূরা হাশর: ১৮)

কিন্তু এ হলো প্রত্যেকের নিজ নিজ পরকালের চিন্তা। ইহকালে ইসলামকে রক্ষা করতে হলে ঐক্যজোট দরকার। কিন্তু একানে একজোট ঐক্যবদ্ধ হয় অন্য জোটের বিরোধিতা করার জন্য। **পারস্পারিক দলাদলির মধ্যে ভবিষ্যতের অপেক্ষা হারিয়ে গেছে।** সবার চোখ বস্তুকেন্দ্রিক বর্তমানের দিকে। আর বর্তমান মানে লোভ-লালসা হিংসা নফস এসব। অথচ সবার উচিৎ ছিল হৃদয়কেন্দ্রিক বর্তমানকে খোঁজা, যার সন্ধান করি আমরা ধ্যানে ও নামাজে। ইসলাম এখন মুখে শোভা পাচ্ছে, গায়ে শোভা পাচ্ছে—টুপি দাড়ি কোর্ত তো আসলেই মার্জিত আবরণ। মার্জিত এবং সুন্দর আবরণ ছাড়া কি কুৎসিতকে লুকিয়ে রাখা অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব? আমাদের এখনকার অনেক মুসলমান হলো কেবল মৌখিক আমল ক'রে তসবি গুণে বেহেস্তে যাবার আগ্রহে উদগ্রীব মুসলমান। এসব নফসেরই কাজ। পরকালে নফ্স যেন আনন্দ পায় তার জন্য এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ই করতে বলেছেন। শুধু এসবই যদি করব, তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য কী করলাম? আমি যে কোম্পানিতে চাকরি

করি সেখানে আমাকে বলে দেয়া হয়েছে আমি কী কী কাজ করলে কী কী পুরস্কার পাব। আমি পুরস্কার নিয়ে যত ভাবব, তত আমার আগ্রহ বাড়বে, কাজেও মন বসবে। এভাবে আমি কাজ করব এবং পুরস্কারটাও পাব। পুরস্কারের চিন্তা এভাবে আমার উপকার করবে। আমি চিন্তা করব পুরস্কার নিয়ে, কোম্পানী নিয়ে নয়, কিন্তু কোম্পানী তার প্রাপ্য ঠিকই পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি সারাক্ষণ ব'সে কেবল পুরস্কার নিয়েই স্বপ্ন দেখি, কাজ না করি, তাহলে কি তা আদৌ পাব? কোম্পানীও কি লাভবান হবে? কোম্পানীর পুরস্কারের পলিসির উদ্দেশ্যেও কি সফল হবে? আল্লাহ্ আমাদেরকে বেহেস্তরূপ পুরস্কার দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা তো কেবল বেহেস্তের পুজো করছি। খালি তসবি গুনছি আর মসজিদে প'ড়ে থাকছি। আর নিজের কথা ভাবছি। একালের বেহেস্ত আর ওকালের বেহেস্ত সব হাতানোর ধান্দা করছি। কর্তব্য পালন করছি না। আল্লাহ্র কাজ করছি না। আমরা সবাই মিলে চক্রান্ত ক'রে প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে আল্লাহ্কে বোকা বানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বেহেস্তকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় মশগুল। তাঁকে আমাদের দরকার নেই। আমরা শুধু চাই তাঁর বেহেস্ত। আল্লাহ্র দেয়া শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অথচ তাতে আমাদের স্বার্থের ক্ষতি হয় ব'লে আমরা তা করছি নিজেদের পক্ষে, অন্যের বিপক্ষে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নামে নিজেই যদি অন্যায় করি তাহলে আল্লাহ্র জন্য কী করলাম? ক্ষমতা এবং জোট থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ না করি তাহলে অন্যান্য কোনো তসবিহ-গোনা ইবাদতই কবুল হবে না। সত্য একটা কঠোর জিনিস। একবার আল্লাহ্ রব্বুল'আলামিন তাঁর ফেরেস্তাকে বললেন একটা বিশেষ নগরীকে ধ্বংস করতে। ফেরেস্তা নগরী ঘুরে এসে আল্লাহ্কে বলল যে তাতে এমন এক আবেদ ব্যক্তি আছেন যিনি রাত-দিন চব্বিশঘন্টা ইবাদতে মশগুল থাকেন। সুতরাং তিনি থাকতে সেই নগরী ধ্বংস করা তো আল্লাহ্র বিধান নয়। তখন আল্লাহ্ বললেন—'ওকেই আগে ধ্বংস কর। সে নিজের বেহেস্তে নিয়ে মশগুল। সে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেনি।'

**আমরা দল ধ'রে অপেক্ষা না করা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠবে না। ঐক্য ছাড়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল থাকছে ততদিন প্রমাণিতভাবে একথা বুঝতে হবে যে এখনও নেতার আগমন ঘটেনি। তিনি এলে তো আর বিভেদ থাকার কথাই নয়। যেহেতু তিনি আসেননি, সেহেতু সবাইকে যার যার কাজ করার সাথে সাথে দূরের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। একমাত্র সম্মিলিত অপেক্ষাই পারে বৈচিত্র্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে।** তখন পরস্পরের মধ্যে যতই

মতভেদ থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে অন্তত সবার মধ্যে ঐক্য থাকবে—**অপেক্ষার ক্ষেত্রে।** অপেক্ষা মানেই লক্ষ্য। লক্ষ্য ছাড়া নৌকা চলে না। লক্ষ্য ছাড়া জীবন চলে না। লক্ষ্যের সংজ্ঞা দ্বারাই ম্যানেজমেন্ট এর পাঠ শুরু করতে হয়। প্ল্যানিং মানেই একটা লক্ষ্য নির্ধারণ ক'রে সেখানে পৌঁছার জন্য কী কতে হবে তা নির্ধারণ করা। জীবনটা একটা প্রতিষ্ঠান। বেঁচে থাকা একটা ম্যানেজারিয়াল কাজ। নিজেকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ম্যানেজ করতে না পারলে অস্তিত্বই বিফল হবে। এখন সবাই যার যার রক্তমাংসের দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। **মানুষে চোখের রোগে ভুগছে, যার নাম মাইওপিয়া। কেউই বেশিদূর পরিষ্কার দেখতে পায় না। তারা ভুলে গেছে যে আল্লাহ্ প্রিয়তম আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।**

অতএব আপনি তাদের কথায় কানই দেবেন না এবং আপনি **অপেক্ষায়** থাকুন, তারাও **অপেক্ষায়** রয়েছে।

(৩২:৩০)

অতএব আপনি **অপেক্ষা করুন,** তারাও **অপেক্ষা করছে।**

(৪৪:৫৯)

আপনি বলে দিন, তোমরা **অপেক্ষা** করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে **অপেক্ষায় আছি।**

(৫২:৩১)

আর আপনি ধৈর্যের সাথে **অপেক্ষা করুন** আপনার রবের আদেশের জন্য।

(৫২:৪৮)

অতএব আপনি **ধৈর্যধারণ করুন** আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের **অপেক্ষায়।**

**(৬৮:৪৮)(৭৬:২৪)**

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের অপেক্ষা আর তাদের অপেক্ষা উল্টোমুখী। তাদের অপেক্ষা তাদের লক্ষ্যের দিকে। যদিও এভাবে নিজের অজান্তেই তারা অপেক্ষা করছে আগুনের—কারণ মানবজাতির অন্তিম গন্তব্য মূলত একই:

নিশ্চয়ই জাহান্নাম **অপেক্ষায়** রয়েছে। (৭৮: ২১)

তবে কি তারা শুধু কেয়ামতেরই **অপেক্ষা করছে, যেন তা তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে পড়ে, আর তারা টেরও না পায়?**

**(৪৩: ৬৬)**

তাদের অপেক্ষা হলো সুদূরের ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং নিকটস্থ জাগতিক ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ ব্যস্ততা। এ কারণে তাদের বিপদ আসবে তাদের অজান্তেই। অপরপক্ষে আমাদের অপেক্ষা হলো সাময়িক আনন্দের প্রতি গাফিলতি,

বর্তমান অস্থিরতার ক্ষেত্রে ধৈর্য, এবং সংঘবদ্ধ **উপেক্ষা**। আমাদের অপেক্ষা, এ কারণে, পুরোপুরি সচেতনতাপূর্ণ। তা না হলে কারা 'তারা' আর কারা 'আমরা'? কেউ কি সঠিক পথে অপেক্ষা না ক'রে বলতে পারে আল্লাহ যাদেরকে 'তারা' বলেছেন তারা নিজেরাই তারা নয়? কিসের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করব যে আমরা বিশ্বাসী, 'তারা' নই?

'আপনারা তো দেখছি অপেক্ষার খাঁটি ফিলোসফিটাই শিখে ফেলেছেন। আচ্ছা, নেতা কোন দিক থেকে আসবেন ব'লে আপনাদের মনে হয়?'

'তিনি এখানকার জনসমুদ্র থেকেও উঠে আসতে পারেন। ওটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।'

'ভাইজান, আপনি আজ আমাকে যা শেখালেন তা আমি পরকালেও ভুলব না। আপনি এক চূড়ান্ত সত্য বলেছেন যা প্লেটো এরিস্টোটল থেকে শুরু ক'রে কার্ল মার্কস লেনিন পর্যন্ত কোনো দার্শনিক সমাজবিদ রাজনীতিবিদ বা রাষ্ট্রনায়ক বলতে পারেননি। পলিটিক্যাল সায়েন্স এই তত্ত্বটাই জানে না। আহ! কী সুন্দর তত্ত্ব—***একটা সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠন করতে হলে অপেক্ষার আগ্রহ থাকা চাই।*** আমার মনে হয় এটাই রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব এবং ফিলোসফি। আল্লাহ্‌র কাছে হাজার শোকর যে তিনি আমাকে নির্জন বন বাদাড়ের জ্ঞানকেন্দ্রগুলো থেকে এমন কিছু রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন যা শিখতে শিক্ষিত বিশ্বের এখনও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ ক'রে বিশাল গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করতে হবে। আমি আপনাদের সামজের সাথে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনাদেরকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি জীবনে এর আগে কোনো মুসলমান সমাজই দেখিনি। আমাদের সাধারণ মুসলমানদের দেখলে মনে হয় যে এখনও তাদের শরীরে বেদুইন যাযাবরের রক্ত রয়েছে, যাদের সম্বন্ধে পাক কোরআনে আল্লাহ্ নিজেই অবমূল্যায়নসূচক কথা না ব'লে পারেননি: (৯:৯০-৯৯), (৯: ১০১-১০৬), (৪৮: ১১-১২, ১৬), (৪৯:১৪) এই আয়াতগুলোতে তাদের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের স্বভাবে এখন মোনাফেকির সুড়সুড়ি। আমাদের ইমানের ভ্রান্তি রয়ে গেছে। আমরা আমাদের যে ইমানকে ইমান মনে করছি তা আসলে ইমান নয়।

আমরা সচরাচর ধ'রে নেই যে মুখে তওবা পড়লেই তা খাঁটি তওবা হয়। অথচ ব্যাপারটা তা নয়। তওবার সাথে **সংশোধন** থাকতে হবে।

ইমানের সাথে **ভালোকাজ** থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন—ওরা কি মনে করে যে শুধু মুখে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি বললেই ওদেরেকে ছেড়ে দেয়া হবে, ওদেরকে পরীক্ষা করা হবে না (দুঃখ-কষ্ট দিয়ে)? —অর্থাৎ একই সাথে আল্লাহ্‌র ওপর সব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

> ....তবে তারা নয় [তারা শাস্তি পাবে না] যারা **তওবা করে, বিশ্বাস করে, এবং ভালোকাজ করে;** আল্লাহ্ এরূপ লোকদের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত ক'রে দেবেন।

(সূরা শু'য়ারাঃ ৬৭-৭০)

আমরা যদি মনে করে বসি যে আমাদের যাকিছু আছে তা স্থায়ী এবং তা একদিন হারাতে হবে এই ভয়ে শংকিত না থাকি, তাহলে আমরা ইমানদার নইঃ

> নিজের প্রতি অবিচার ক'রে সে একদিন তার বাগানে প্রবেশ করল; সে বললঃ আমার তো মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে। আর আমি ধারণা করি না যে, কেয়ামত হবে। আর (তা ছাড়া) যদিও আমাকে কখনও আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তাহলে সেখানে আমি এর চেয়ে উচ্চ স্থান পাব।

(১৮:৩৫-৩৬)

এরকম আত্মবিশ্বাস বিশ্বাসীকে মানায় না।

> আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসীরূপে তাঁর কাছে উপস্থিত হবে এ **অবস্থায় যে,** সে **অবশ্যই ভালো কাজ করেছে,** এমন লোকদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

(২০:৭৫)

> আর আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, যে **তওবা করে, বিশ্বাস করে, ভালোকাজ করে, ও সৎপথে অটল থাকে।**

(২০:৮২)

> সে ব্যক্তি বিশ্বাসী অবস্থায় **ভালোকাজ করে,** সে অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না।

(২০:১১২)

> যে ব্যক্তি বিশ্বাসী অবস্থায় **ভালোকাজ করে,** তার প্রচেষ্টা/পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না।

(২১:৯৪)

> আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ **দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে** ইবাদত করে, যদি তার কোনো পার্থিব লাভ হয়, তবে সে তাতে প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি তার

ওপর কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে আগে (অবিশ্বাসী) অবস্থায় **ফিরে যায়**। এতে সে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয়টাই হারিয়ে বসে। এটাই হলো প্রকাশ্য ক্ষতি।

(২২:১১)

নিশ্চয়ই যারা **বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে,** আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

(২২:১৪)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জান্নাত দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা **বিশ্বাস করেছে এবং ভালোকাজ করেছে।**

(২২:২৩)

আর ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে। (২৮:৫৪)

আমরা কি **ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করি? ভালো ব্যবহার পাবার দাবি প্রত্যেক মন্দ লোকের রয়েছে।** তা না করলে তার মন্দ প্রবণতা বেড়ে যায়। দয়া, ক্ষমা, ও সৌজন্যের হক আদায় না করলে অন্তরের সেই দারিদ্র্য সমাজে ব্যাধি ছড়ায়। অথচ আমরা তো ধর্ম ও সত্যের নামে কেবল সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেই। এভাবে (২৭:৯০); (২৮:৬৭, ৮৩, ৮৮); (২৯: ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৫৮, ৬৮, ৬৯); (৩০: ১৫, ৩৩, ৩৬); (৩১: ৩); (৩২: ২২); (৩৩: ৭, ৮, ১০, ৩৫, ৭০); (৩৫: ৭); (৩৬: ১১); (৩৭: ৬১, ৮০, ১০৫); (৩৯: ৩৪, ৭৪); (৪১: ৮); (৪৫: ২১); (৪৯: ১৪, ১৫, ১৬); (৫৮: ২২); (৫৯: ৯); (৬১:১১); (৬৫:১১) আয়াতের দিকে খেয়াল করলেই বুঝা যাবে ইমান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত ভ্রান্ত। আয়াতগুলোকে সুন্দর ক'রে লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ভালো। সম্ভবত আমরা সবাই **ভালো কাজ** বাদ দিয়েই ইহকাল ও পরকালে বেহেস্ত পেতে চাচ্ছি।—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'অন্ধকার থেকে।'

'আলোর সন্ধানে?'

'না।'

'তাহলে?'

'আলোকে সন্ধান করার মতো প্রয়োজনীয় আলোটুকুও আমার কাছে নেই। এসেছি আলোর আকর্ষণে।'

'নিশ্চয়ই পুড়তে শিখেছেন?'

'আপনারা যেমন দল ধ'রে অপেক্ষা এবং আকাঙ্খার আগুনে পুড়ছেন, তেমনটা আর পারলাম কই।'

'কাঠ পোড়ার প্রথম দিকেই জানা যায় তা কতটা ভেজা ছিল।'

'জ্বী, সত্য বলেছেন। তখন ধোঁয়া বেশি হয়।'

'আমরা এখনও ধোঁয়ার আবর্তে আছি। দোয়া করবেন।'

'তাও ভালো। এখানকার সবগুলো গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতেই চব্বিশ ঘন্টা আগুন পাওয়া যায়।'

'জ্বী। সব আল্লাহ্‌র রহমত। বাড়িতে বাতের রোগী থাকা আসলেই ভালো। আলোতে আমাদের কোনো হাত নেই। তবুও আমরা তো অন্তত আগুনটুকু জ্বালাতে পারি।'

'এবং যা জ্বালাতে পেরেছি তা একটু খড়কুটো বেশি পুড়িয়ে জ্বালিয়েও রাখতে পারি।'

'পতঙ্গের যখন ঝাপ দেবার সময়, তখন আগুন না পেলে তার জীবনটাই বিফল হয়।'

'ঠিক।'

'সব ঘরগুলোতে একসাথে আগুন জ্বালানোর অভ্যাস করাটা ভালো। ঘর গরম রাখা দরকার। তিনি যদি মাঝরাতে এসে বসেন, তখন যেন শীতের রাতে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠতে সমস্যা না হয়। আগুন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ মহাবিশ্বের সুন্দরতম কথাগুলোই বলেছেন:

> স্মরণ কর তখনকার কথা যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, 'আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব, অথবা তোমাদের জন্য আনতে পারি জ্বলন্ত কাঠখণ্ড, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।' অতঃপর সে যখন আগুনের কাছে এল তখন তাকে ডেকে বলা হলো, '*ধন্য তারা যারা আগুন দ্বারা আলোকিত স্থানে এবং তার চারপাশে।'*

(২৭: ৭-৮)

'আহ, সুন্দর উদাহরণ! পুড়তে মন চায়। প্রেমের আগুন! চেতনার আগুন! তারপর জ্ঞানের আলো! জীবনের আলো! শিখা অনির্বাণ!

বাংলাদেশের ‘শিখা অনির্বাণের’ পাশে উপরের আয়াতগুলো লিখে রাখা উচিৎ—যেন কারো বুঝতে সমস্যা না হয় যে এই আগুন বাইরে প্রতীক এবং ভেতরে আলোস্বরূপ, তা পুজোর উদ্দেশ্যে নয়। এ নিয়েও আমার দেশে অনেক বিভ্রান্তি হয়েছে এবং হচ্ছে। —আচ্ছা, তিনি এলে কিভাবে জনা যাবে?’

‘সূর্য উঠছে কিনা তা দেখার জন্য কি টর্চলাইট লাগে?’

‘আমি আপনার আস্থাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি মহাবিশ্বের যেখানেই থাকেন না কেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ছুটে আসার জন্য উদগ্রীব রয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর পথকে ছোট ক’রে দিন—এই কামনা। খোদা হাফেজ।’

‘আপনার সামনের সব বাঁকা পথ সোজা হয়ে যাক। পথের মায়া গন্তব্যকে ভুলিয়ে না দিক। খোদা হাফেজ।’

এগার

## প্রথম মৃত্যু

বুড্ডা ফিরে এসে এই অপেক্ষার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। সে ভাবল—অপেক্ষা কেন করতে হয়? কেন সবকিছু পূর্বনির্ধারিত অথচ কোনো কিছু আপনা আপনি ঘটে না? ভাগ্য নির্মাণে মানুষের ভূমিকা নেই অথচ ভাগ্যে-নির্ধারণে তাকে প্রচেষ্টাহীন হওয়া চলে না কেন? আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি ততক্ষণে কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটায়। তাহলে ভাগ্যই বা কী? পূর্বনির্ধারণেরই বা কী অর্থ থাকল? সে এও জানে যে এই একটি বিষয়ই মানব জাতির অধিকাংশকেই অবিশ্বাসী, বিদ্রোহী, দাম্ভিক হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। ফলত তার এই প্রশ্ন কোনো নতুন প্রশ্ন নয়, যদিও তা মৌলিক। তাছাড়া এই ইস্যুটি আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম **রাজনৈতিক ইস্যু**। এর রহস্য না বোঝার কারণে অনেকে বিভ্রান্ত হয়, ধাঁধাঁয় পড়ে যায় এবং ফলত তারা অহংকারী না হলেও গাফেল বা অলস ও উদাসীন হয়ে ওঠে। ফল হয় একই—ধ্বংস। তার পুরোপুরি জানা আছে যে এই সমস্যাটা মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক সমস্যাও বটে। ***অধিকাংশ মানুষ দর্শন শাস্ত্র বা ফিলোসফি কাকে বলে তা বোঝে না। যারা বোঝে তাদেরও লাখে একজন তা বোঝার জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত নয়। অথচ গোটা মানবজাতি আটকে আছে এমন কিছু মৌলিক সমস্যার মধ্যে যেগুলোর চরিত্র পুরোপুরি দার্শনিক। অবশ্য এর চেয়ে বড় আত্মবিরোধ এখানে যে অধিকাংশ মানুষ তাদের মৌলিক সমস্যাগুলোকে কখনও দার্শনিক গুরুত্বে বিবেচনা করতে জানে না, অথচ তারা সেসব সমস্যার পুরোপুরি দার্শনিক সমাধান চায়।***

হাজার হাজার বছর ধ'রে দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রকে কেবল একটি বিশ্লেষণ-আলোচনা-তত্ত্বগঠনের চিন্তাকাঠামো হিসেবে বিবেচনা ক'রে এসেছেন, গুরুত্ব-নির্ধারক চেতনার অনুশীলন হিসেবে নয়; অথচ দর্শনশাস্ত্র যতটা না বিশ্লেষণের জন্য, তারও বেশি জীবনের বাস্তবতায় বিশেষ কিছু মৌলিক মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের **গুরুত্ব** নির্ধারণের জন্য। একথা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন কার্ল মার্কস। তাই তো তিনি সাহসী কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—এতকাল দার্শনিকগণ জগৎটাকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, এখন প্রয়োজন এটাকে পাল্টে দেয়ার। তিনি তা করেওছিলেন, যার রেশ এখনও আছে, থাকবেও বহুকাল। জ্ঞানসাধনার সাথে চেতনার এই উচ্চমাত্রা যোগ করতে গিয়ে তার দর্শন অনেকাংশে দর্শন থাকেনি সত্য—তা রূপলাভ

করেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞানে—তবুও পৃথিবীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দার্শনিক ছিলেন তিনিই। আসলে তিনি যে জায়গাটতে হাত দিয়েছিলেন, মানব জীবনের মৌলিক দার্শনিক সমস্যাগুলো আটকে আছে তার খুব কাছাকাছি। এই পর্যায়ে এসে সমস্যাটা পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক। এ কারণে নীরিক্ষণ-নির্ভর বা একস্‌পেরিমেন্টাল মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা তা জানা সম্ভব নয়। পৃথিবীর মনস্তত্ত্বের গোড়াপত্তন যারা করেছিলেন, তারা সবাই ছিলেন দার্শনিক। বুড্ডার মনে প্রশ্ন উদিত হলোঃ 'এই সমস্যার সমাধানের জন্যও কি অপেক্ষা করতে হবে?'

হঠাৎ সেখান গুরুজী এলেন।

বুড্ডা উঠে দাঁড়াল।

গুরুজী বললেন—'মাথাটাকে ঝেড়ে এস। মাথায় এত ধুলো নিয়ে চিন্তা কর কিভাবে?'

বুড্ডা মাথাটা ঝাড়তে অদূরে উঠোনের একটি গাছতলায় চ'লে গেল। গুরুজী পেছন থেকে ডেকে বললেন—'কান দুটোও ভালো ক'রে ঝেড়ে নিও। তোমার কানের মধ্যে গুমোট বাতাস। আমার কথা শোনার আগে ওজু করার দরকার নেই। তবে কানে ময়লা থাকা ভালো না।'

বুড্ডা লাফিয়ে লাফিয়ে কানের ময়লা পরিষ্কার করতে লাগল। কানে পানি গেলে যেমন করতে হয় তেমনভাবে সে তার চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

সে ফিরে এলে গুরুজী বললেন—'আমি জানতাম।'

'জ্বী, গুরুজী, এখন মাথাটা অনেক হালকা লাগছে।'

'শোনো তাহলে......' এই বলে গুরুজী চুপ ক'রে বসে রইলেন।

বুড্ডাও চুপ ক'রে বসে রইল।

গুরুজীও চুপ ক'রে বসে রইলেন।

বুড্ডাও চুপ ক'রে বসে রইল।

গুরুজীও।

বুড্ডাও।

‘বুঝতে পেরেছ কিছু?’

‘না গুরুজী। কিন্তু শুনেছি।’

‘জানতাম।’

‘জ্বী, নীরবতাকে শোনা যায় কিন্তু বোঝা যায় না।’

‘কারণ তা বোধেরও অতীত।’

‘স্বীকার করছি।’

‘সত্যকে তুমি স্বীকার না করলেও সত্য সত্যই। আল্লাহ্ বলেছেন:

> তারা কি **এতটুকু** জানে না যে, তারা যা গোপন করে কিংবা যা প্রকাশ করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন? (২: ৭৭)

কি চমৎকারভাবে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছেন—তারা কি এতটুকুও জানে না....? কারণ অন্তত এতটুকু তাদের জানারই কথা। কিভাবে? দেখ, তুমি তোমার উৎসকে স্বীকার কর কি না কর, তা কি তুমি **নিজে জান না?** অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধে তোমার যে নিজস্ব **সচেতনতা** আছে হৃদয়ের গভীরে, সে ব্যাপারে কি তুমি সচেতন নও? অন্য কথায়, এই সচেতনতা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান বা না জান, তার অস্তিত্বের ব্যাপারে তুমি কি নিশ্চিন্ত নও? সচেতনতা না থাকলে তুমি কি ভাবে জানবে তুমি আদৌ কোনো কিছু জান কি না বা কোনো বিষয়ে অজ্ঞ কি না? অর্থাৎ **তুমি সত্যকে জান বা না জান, এই জানা বা না জানার ঘটনাটা তুমি নিজেই জান। সত্য চিরকালই সত্য থাকে। যা আছে তা আছে। তোমার জানা-না-জানা তার অস্তিত্বকে বিঘ্নিত করতে পারে না**। আল্লাহ্ বলেছেন:

> বরং মানুষ তো নিজেই নিজের সম্বন্ধে ভালোভাবে জানে।
>
> (৭৫:১৪)

এই আয়াতেও consciousness এবং বিবেকের কথা বলা হয়েছে। সাধক মাত্রই জানেন যে এটাই reality-র স্তর।

> শপথ মানবের মানস-কাঠামোর এবং তার যথাযথ অনুপাত-বিন্যাসের। এবং শপথ তার **ভালো-মন্দ নিরূপণের যোগ্যতার**। নিশ্চয়ই সে কৃতকার্য হয় যে এই মানস-

কাঠামোকে পবিত্র রাখে। এবং সে ব্যর্থ হয় যে তাকে কলুষিত করে। (৯১: ৭-১০)

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত, এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬:১০৩)

অর্থাৎ দৃষ্টির পেছনে তিনি আছেন। সুতরাং 'আমি তাকে দেখি না তো' বললেই বরং তাঁর সত্যতাই প্রমাণিত হয়—**তুমি যে দেখছ না, এটাই বা তুমি কি ভাবে বুঝলে? এটা তুমি যে কিভাবে বুঝলে—তা তুমি নিজেও জান না। তবুও কোনো-না-কোনো ভাবে তুমি বুঝতে পার যে তোমার বোধেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং তোমার বোধের এই সূক্ষ্ম স্তরই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের স্তর। তোমার জন্য যা চেতনা, অর্থাৎ জ্ঞানের** জ্ঞান বা জ্ঞানের পটভূমি বা metaknowledge, তাঁর জন্য তা হলো **স্পষ্ট জ্ঞান**। এজন্য তিনি কোরআনকে বলেন **স্পষ্ট গ্রন্থ** (কিতাবুম মুবীন), মানুষের পাপকে বলেন **স্পষ্ট পাপ, স্পষ্ট ক্ষতি, স্পষ্ট ভ্রান্তি,** ফেরাউনের যাদু অন্যের কাছে গোপন কৌশল হলেও তাঁর কাছে তা স্পষ্ট বা **প্রকাশ্য যাদু** (সিহরুম মুবীন)। অর্থাৎ তুমি তাঁকে সত্য জেনেও মিথ্যা সাব্যস্ত করছ। তোমার জ্ঞান এবং চেতনা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে, অথচ তুমি চেতনার আগুনে না পুড়ে শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্য সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করছ। তোমার এই ধারণাই তোমার জ্ঞানকে তোমার চেতনা থেকে আলাদা ক'রে দিয়েছে:

তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে।

(৪১: ২৩)

আর এ কারণে তুমি জ্ঞানী হয়েও সাবধান হতে পারছ না:

বল, 'কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে মৃত হতে জীবিত নির্গত করেন এবং সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?'

(১০: ৩১)

দেখ, **যারা এই 'কে' এর উত্তর জানে, তারা যা জানল তা কিভাবে জানল তা জানল না**। তারা শুধু কান নিয়ে চোখ নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখে না যে এই যন্ত্রগুলোর মধ্যে **কনশাসনেস** না থাকলে সেগুলো কোনো কাজ করত না? জীবিত প্রাণী ও নির্জীব বস্তুর মধ্যে পার্থক্যের

সীমারেখা কী? **আত্মচেতনা,** যার biological নাম হলো life বা প্রাণ। এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তারা সাবধান হবে কিভাবে? **সাবধানতা মানে কী? তার মানে তো জ্ঞানকে আচরণের মধ্য দিয়ে চালিত করা।** জ্ঞানের ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আমি বলি যে তোমার এই জ্ঞান মূলত কোনো জ্ঞানই নয়, কারণ তা তোমার আচরণকে সঠিক পথে চালিত করতে পারে না:

> তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ্'। বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, কিন্তু কিন্তু ওদের অধিকাংশই *জানে না।*

**(৩১: ২৫)**

'তুমি কি তাহলে এখন বলতে চাও যে তুমি জ্ঞানী? না কি তোমার মাথায় কিছু ছেড়ে দেব?'

'নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে।'

'এটাই জ্ঞানের প্রথম ধাপ।'

'আপনার সামনে যদি অভিনয় করা জায়েজ থাকত তাহলে আমি রীতিমতো অভিনয় ক'রে বোকা সাজতাম। তাতে যেটুকু জ্ঞান আল্লাহ্ দিয়েছেন তা সার্থক হতো।'

'জানতাম।'

'আপনার দ্বারা তা না জানাই সম্ভব নয়।'

'এ জন্যে আমার স্ত্রী আমাকে পাগল বলতেন। মেয়েরা চায় না যে তাদের মনের খবর তাদের আচরণের আগে ভাগেই কেউ জেনে যাক। তাতে তাদের ব্যক্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। কিছু জিনিস গোপন এবং রহস্যময় না রাখতে পারলে নারী নিজেকে অন্য নারী ও পুরুষ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে না। রহস্য মানে রহস্যই। যা প্রকাশ করা যায় তা আর রহস্য থাকে কিভাবে? প্রতিটি নারী নিজেকে রহস্যময় ক'রে তুলতে চায়। কারণ পুরুষের কাছে সে কাম্যবস্তু। যাকে জানা যায় তাকে মানুষ আর চায় না, তা আর কাম্যবস্তু থাকে না। নারীর ব্যক্তিত্বের একটা অংশ জ্ঞানেরও অতীত। অন্তত সে তা প্রকাশ পাবে ভয়ে নিজেও তা জানতে চায় না। এজন্যই পুরুষ তাকে চায়। পুরুষ জানার আগ্রহে তাকে ড'লে পিষে অরেঞ্জ জুস্ বানিয়ে খায়। তাতেই নারীর প্রকৃতিক আনন্দ। কিন্তু পুরুষটা শুধু ভোগ করতে চায়

না, জানতেও চায়। তখন সে প্রশ্ন করে—তোমার আসল রহস্য কী গো?—অমনি নারী ঠাস ক'রে তার গালে একটা থাপ্পর মারে। পুরুষ এক হাত দূরে গিয়ে হঠাৎ ক'রে অবাক হতে হলো কেন—একথা ভাবতে ভাবতে চোখ চেরা চেরা ক'রে তাকায়। নারী মনে মনে বলে—এটাই রহস্য। দূরে দূরে থাক। কাছে আসার জন্য উতালা হও। দূর থেকে এসে আমাকে জবরদস্তি ও মূল্য প্রদানের মাধ্যমে দখল কর। তারপর যদি কাছে থাকতে চাও, তো মর্যাদা দাও। কিন্তু মর্যাদা না দিয়ে যদি আমাকে তোমার গবেষণার বিষয়বস্তু বানিয়ে আমার রহস্য জানতে চাও, তো ঠাস্।

মানুষ বুঝল না যে তাদের মূল সত্তার রহস্যটাও এরকম। ভাগ্যের রহস্য এমন যে তা আমাদের অস্তিত্বের একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডের সংবিধান। তা আমাদের অস্তিত্বের রহস্য। রহস্য ব'লেই তা মূল্যবান। তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। দূর থেকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর কাম্য। অনুমতি পেলে প্রবল আগ্রহ নিয়ে কাছে গিয়ে ভোগ করতে হবে আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত। ভোগ করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা চাই, যোগ্যতা চাই। সেক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে চলবে না। তুমি ভোগ করছ ভাগ্যকে, তাহলে আবার সেক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে কিভাবে? তুমি যদি তাকে রহস্যময় এবং সত্য ধ'রে নিয়ে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে প'ড়ে থাক, তাহলে সে তোমাকে আনন্দ দেবে। অপরপক্ষে তুমি যদি তোমার বন্ধুত্বকে নিয়েই গবেষণা মত্ত হয়ে পড়, তো ঠাস্।'

'তার মানে দুর্ভাগ্য নামবে?'

'তা তো বটেই। কারণ তুমি বন্ধুত্ব চাও না, বন্ধুত্বের রহস্য জানতে চাও। সব কেরামতি নিজের হাতে নিয়ে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে চাও। তখন ভাগ্য তোমার যুক্তি-মেধাকে একটা আত্মবিশ্বাসের ফুল উপহার দেবে যাতে কাঁটা বেশি। বিষাক্ত সে কাঁটা। তা নিয়ে দার্শনিক গবেষণা চলে, যেমনটি করেছিলেন ডেডেকিনড, ক্যানটর, হিলবার্ট, হিটগেনস্টাইন, ওয়াইটহেড, রাসেল, নীটশে প্রমুখ। কিন্তু তা নিয়ে বন্ধুত্ব চলে না। তখন সে সব আত্মবিরোধ বা contradiction বা ধাঁধাঁর চরকার খেলা দেখিয়ে দর্শক শ্রোতাকে মজানো যায়, ধনী হওয়া যায়, অনেক টাকাও কামানো যায়। কিন্তু সুখী হওয়া যায় না। মুক্তি পাওয়া যায় না। আত্মবিরোধ মানেই তো নিজের সাথে বিরোধ। তার মধ্যে আটকে গিয়ে তারই সাহায্যে মুক্তি কামনা—এটা তো আরো বড় আত্মবিরোধ। ভাগ্যের রহস্য যদি সব জানা যেত, তাহলে অস্তিত্ব ব'লে কিছু থাকত না। কোনো উপায়ে তা জানা সম্ভব হলে সবই

অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত। কারণ তুমি যা জান বা জেনে ফেলেছ তাতে তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। তার সঙ্গে তোমার আর কোনো বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ভাগ্যের রহস্য জানা সম্ভব কেবল ভাগ্যকে অতিক্রম ক'রেই, তার আগে নয়—কিন্তু তাকে অতিক্রম করার পর তা আর রহস্য থাকে না, তখন যে অতিক্রম করল, সে নিজেই রহস্যে পরিণত হয়। তা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত তাকে মেনে নিতেই হবে। এই না জানার দুর্বলতাকে ভালোবাসতে হবে। মানুষ রহস্যপ্রিয়। এই না জানার রহস্য লুকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ্ একটি মূল্যবান সিন্দুক বানিয়েছিলেন। জান তার নাম? শুনেছ সে সিন্দুকের গল্প কখনও?'

'জ্বী, না।'

'সে সিন্দুকের নাম *মানুষ*।'

বুড্ডা কেঁপে উঠল।

'আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছিলেন এমন কিছু জানার জন্য যা গোটা মখলুকের আর কোনো প্রজাতির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই আদম (আঃ) কেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এমন কিছু রহস্য ***না জেনেই*** আনন্দিত থাকতে যা আল্লাহ্র নিজস্ব। মানুষের মধ্যে তিনি এমন কিছু রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন যা মানুষ না জেনেই মুক্তি পাবে, ***না জানার কারণেই*** মুক্তি পাবে, ***না জানতে পেরেই*** আনন্দিত হবে। কারণ তা না জানতে পেরেই সে বুঝতে পারবে যে সে অসীম। সে অমর। সে সয়ম্ভূ সত্তার সাথে অস্তিত্বের প্রান্তে গিয়ে মিশে আছে। সে নিছক একটি জীব নয়। তার চিন্তাশক্তির দড়িটার একটা মাথা বাঁধা রয়েছে এমন এক জগতে যেখানে চিন্তা পৌঁছায় না। সে ব্যাখ্যা আল্লাহ্ চাইলে অন্য কোনো সময়ে দেব।

এজন্য মানুষকে আত্মবিরোধের ফাঁদ থেকে বাঁচানোর জন্য রসূল (সঃ) বলেছেন: 'তোমরা ভাগ্য ও আমার সাহাবাদের প্রসঙ্গে কথা উঠলে চুপ ক'রে থাকবে।' তিনি ভাগ্যের প্রসঙ্গটাকে তুলেছিলেন দার্শনিক ও অজ্ঞদের বাঁচাতে। এই দুই জাতের লোকই তা নিয়ে বেশি প্রশ্ন তোলে। শুধু তাই নয়, এই দুই জাতের লোকই প্রশ্ন ক'রে বেশি। আর তিনি তাঁর সাহাবাদের (আঃ) কথা বলেছিলেন রাজনীতির ইতিহাসবিদদেরকে বাঁচাতে। কারণ তারা ইসলামের নামে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যুগের রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইসলাম সম্বন্ধে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু তার পরও সবাই চিন্তা করতে চায়, বাঁচতে চায় না। গবেষণা

করতে চায়, বন্ধুত্ব করতে চায় না। সিজদা করতে চায় না। আত্মসমর্পণ করতে চায় না। কেউ কেউ কেবল বিশাল অহংকারীর মতো পর্বতের মতো দৃঢ় হয়ে ব'সে থেকে ধ্যান করতে চায়। মাথা নোয়াতে চায় না। মস্তিষ্কহীন শূন্যতাকে খোঁজে, রিপুহীন শূন্যতার মহাপ্রেমের মহাসমুদ্রে ডুবতে চায় না।'

'গুরুজী, আমি সহজ মানুষ হলেও আমার যদি সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কর্তৃত্ব থাকত তাহলে আমি আপনাকে একটা কঠিন উপাধি দিতাম।'

'আমার স্ত্রীর দেয়া উপাধিটাই আমার বেশি পছন্দ।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ।'

'উনি চিন্তা না ক'রেই জ্ঞানীর মতো কথা বলেছিলেন।'

'এ জন্য নারীর বোকামিকে হাসিমুখে মেনে নেয়া উচিৎ। রসূল (সঃ) তা করতে আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তা যে করতেব, তার জন্য পুরষ্কারের ঘোষণাও দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে, যে স্বামী তার স্ত্রীর ছোটখাট দুর্ব্যবহারকে ***হাসিমুখে ও নীরবে*** সহ্য করবে, সে কবুল হজ্বের সওয়াব পাবে। হজ্ব তো অনেকেই করে, কারটা কবুল হলো কে জানে? অথচ এই দ্ব্যর্থহীন সন্দেহমুক্ত ঘোষণাকে বিশ্বাস ক'রেও যে কেউ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাও ঘটছে না। ইদানিং হুজুররাই বেশি স্ত্রী-নির্যাতনকারী।'

'উনি কি বিশ্বাস করতেন যে আপনি আসলেই পাগল?'

'মেয়েরা নিজেদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করার যোগ্যতা রাখে না। এ কারণে তারা চিন্তা ক'রে যা পায় তাতে বেশি আস্থা রাখতে পারে না। উনি আমাকে পাগল বলতেন। আমি যখন বলতাম—'আমি তো তোমার পাগল'—তখন গ'লে যেতেন। আমি তখন তার চোখের শরবত পান করতাম এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতাম। যেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতাম, অমনি উনি বুঝে ফেলতেন যে আমি মূলত আল্লাহ্‌র পাগল। তখন উনি আল্লাহ্‌কেই হিংসা করতেন।'

বুড্ডা এবং গুরুজী উভয়েই হাসলেন।

'কিন্তু গুরুজী, ভাগ্যের রহস্য কেন জানা যায় না তা কি জানা উচিৎ নয়?'

‘তা উচিৎ এবং সম্ভব। তুমি তো এতক্ষণে তা-ই জেনেছ।’

‘এবং একথা জেনে আমি আনন্দিত যে আমি অনেক কিছু জানি না। এবং আমি একথা জেনে আরো আনন্দিত যে আমার দ্বারা কিছু জিনিস কখনোই জানা সম্ভব নয়। এবং আমি একথা জেনে আরো আনন্দিত যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ‘জানা’ শব্দটার কোনো অর্থ নেই। কিংবা হয়তো আছে, প্রকাশ নেই।’

গুরুজী বললেন, ‘এবং আমি একথা জেনে আরো বেশি আনন্দিত যে সেই রহস্যময় জিনিসগুলো আমি অনন্তকাল ধ’রে জানার চেষ্টা ক’রে যাব, অথচ কখনই তা জানতে পারব না, অথচ আমি চিরকাল তাঁর কাছাকাছি এগোতে থাকব, অতচ আমার জানার তৃষ্ণা আরো বাড়তে থাকবে, অথচ আমি ক্রমে ক্রমে জানতে থাকব যে সবকিছু আরো বেশি ক’রে জ্ঞানের অজ্ঞতার মধ্যে ঢুকে পড়ছে, অথচ তাতে আমার আনন্দ বাড়তেই থাকছে, অথচ আমি অনন্তকাল ধ’রে আরো বিনীতভাবে সিজদা দিতেই থাকব....।’

গুরুজীর কথা শেষ না হতেই বুড্ডা মূর্ছা গেল। জেগে ওঠার সাথে সাথেই সে প্রশ্ন করল—‘গুরুজী, আপনি প্রথম ‘এবং,’ প্রথম ‘জেনে,’ আর শেষের ‘অথচ’—এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেন কেন?’

‘প্রথম ‘এবং’ দ্বারা আমি আমার কথাকে তোমার কথার সাথে জুড়ে দিলাম। ফলে কথাটা এখন থেকে তোমার হয়ে গেল। তুমিও তো প্রথমে নিজের অজান্তেই তা করেছ।’

বুড্ডা চোখ খোলা রেখেই জ্ঞান হারাল। গুরুজী তাকে জাগালেন এবং বললেন—‘প্রথম *জেনে* শব্দটাকে ব্যবহার করেছি এজন্যে যে সব জানা এবং না জানা ঘটবে জ্ঞানেরই মধ্যে।’

বুড্ডা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। গুরুজী ব’লে চললেন—শেষের *অথচটাকে* উচ্চারণ করেছি এজন্য যে মানুষ আনন্দ পেলে অহংকারী হয়ে ওঠে। যেমনটি আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদারক আনন্দ পাবার পরও আমার আত্মসমর্পণ কমবে না, বাড়বে। তুমি এখানে একটা ‘এবং’ কে আশা করেছিলে। কিন্তু সিজদার সাথে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ‘এবং’ থাকলেও মানুষের তরফ থেকে আছে একটা মোটা অক্ষরের ‘অথচ’। মানুষ বলে ‘আমি,’ আল্লাহ্ বলেন ‘তুমি না আমি’। এই ***রাজনৈতিক শত্রুতার*** অবসান ঘটে সিজদায়। তখন মানুষ তার ‘আমি’

কে হারিয়ে নিরহংকারী হয়, মৃত্যুবরণ করে। তখন আল্লাহ্ বলেন—‘এবার জেগে ওঠ এবং বল আমি।’ ততক্ষণে দুই *আমি*-র মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।’

বুড্ডা কোনো কথা বলল না। পুরনো বিল্ডিংয়ের থামের মতো দাঁড়িয়ে রইল। গুরুজী বললেন, ‘আল্লাহ্ নিজের তরফ থেকে সিজদার কথা বলেন ‘এবং’ দিয়ে:

তুমি সিজদা কর ***এবং*** আমার নিকটবর্তী হও।

(সূরা আলাক্ব: ১৯)

বুড্ডা সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। গুরুজী বললেন—‘এখন কে?’ সিজদা থেকে উঠতে বুড্ডার একটু দেরি হয়েছিল।

বার

## বাংলাদেশে গণমৃত্যু

গুরুজীর সাথে রান্নার কাঠ কাটতে কাটতে বুড্ডা বলল—'তবুও অনেক বাকি রয়ে গেছে, গুরুজী।'

'বাকিটাই জীবন,' বললেন গুরুজী, 'এবং যা গত হয়েছে তা স্মৃতিমাত্র।

'তাহলে কি আমাকে ভবিষ্যতের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে?'

'ভবিষ্যৎ কল্পনা মাত্র। কল্পনা জীবনের মঞ্চায়ন মাত্র।'

'তাহলে?'

'ম'রে যাও?'

'ম'রে কোথায় যাব? সব তো নিষিদ্ধ জায়গা—অতীত, ভবিষ্যৎ।'

'ভবিষ্যৎ থেকে ম'রে কাছাকাছি এগিয়ে এস।'

'বর্তমান তো জায়গা দেয় না। তাড়িয়ে দেয়।'

'হঠাৎ ক'রে মরতে শেখ। অত হিসেব নিকেশ ক'রে ম'রে কোনো লাভ নেই। তাতে মৃত্যু হবে আঘাটায়। চিন্তাই দূরত্ব।'

'আহ! যদি বজ্রপাতেও মৃত্যু হতো!'

'ওটাই তোমার দরকার। আল্লাহ্ বজ্রপাত দ্বারা মানুষকে অন্ধকারে পথ দেখান। ফলে তার মধ্যে আশা ও ভয়ের সঞ্চার হয়। তারপর বজ্রপাতের আলো দিয়েই তার আলো কেড়ে নেন, ফলে সে নিরাশ হয়ে পড়ে।

> তাদের অবস্থা ঐ লোকের মতো যে কোথাও আগুন জ্বাললো, পরে যখন আগুন তার চারিদিকের সবকিছু আলোকিত করল, তখন আল্লাহ্ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।
>
> (২:১৭)

তারা জ্বালল আগুন, আল্লাহ্ সে আগুন কেড়ে নিলেন না, কেড়ে নিলেন **তাদের** আলো, তাদেরই জ্ঞানের স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা। আলো দিয়ে আলো কেড়ে নেয়ার অর্থ কী? তা কিভাবে সম্ভব? যা দেন তা কেড়ে নেন? নাকি যা

দিয়েছিলেন তা কেড়ে নেন? এখানেই রহস্য। আল্লাহ্ কেড়ে নেন 'তাদের আলো', আগুনের আলো নয়। আগুনকে ভালোবাসলে তার আলো ব্যক্তির চোখের অন্ধকারকে দূর ক'রে দেয় এবং সে আর কোনো অন্ধকার দেখতে পায় না। অপরপক্ষে আগুনকে ভালো না বাসলে তার আলো ব্যক্তির চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এবং তাকে অহংকারী ও অন্ধ ক'রে দেয়। জ্ঞান ও আঘাতের আশংকা থেকে লব্ধ প্রজ্ঞার আলো দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে পথ দেখান। তুমি আশান্বিত হও। কিন্তু তুমি যদি অহংকারী হও, তাহলে তোমার জ্ঞানই তোমার অজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। তুমি জ্ঞানের ফাঁদে আটকা প'ড়ে যাও। আর তুমি যদি বিনয়ী এবং প্রেমিক হও, তাহলে সেই তীব্র আলো তোমার পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানের অন্ধত্ব দূর ক'রে দেয়। ফলে তুমি আলোকিত হয়ে ওঠ, নিভে যায় তোমার নিজস্ব সংকীর্ণ আলো। একই ঘটনায় ব্যক্তি ভেদে দুই ফলশ্রুতি। যা জীবন, তাই মৃত্যু। তোমার জন্য যা জীবন, অন্য কারো জন্য তাই-ই মৃত্যু। কোরআনের আলোও এরকম। তা কারো জন্য আলো, কারো জন্য অন্ধকার।

> তুমি যখন কোরআন আবৃত্তি কর তখন তোমার ও যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে আমি প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই [অর্থাৎ চেতনার স্তর থেকে আমি তাদেরকে আলাদা ক'রে রাখি, কারণ তাদের লক্ষ্য (ইমান) তোমাদের লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত]।

(১৭:৪৫)

> কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কোরআন হবে তাদের জন্য ***অন্ধকারস্বরূপ***।

(৪১:৪৪)

ফলে কোরআনই কাউকে বাঁচিয়ে তোলে। আবার কোরআনই কাউকে ধ্বংস করে। তোমার দেশে অনেক খুনী রয়েছে যারা কোরআনের হাফেজ। তাদেরকে ধ্বংস করছে কিসে? কোরআনই। কোরআনের বিপুল শক্তি তাদের বাঁকা মনকে আরো বাঁকা ক'রে দিয়েছে:

> যে ব্যক্তি....আল্লাহকে ভয় করে...এবং যা সুন্দর তা সত্য ব'লে বিশ্বাস করে, আমি অবশ্যই তার জন্য **সহজ করে দেব সুখ-শান্তির পথ**। আর যে নিজেকে বেপরোয়া/স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে, এবং যা ভালো তা বর্জন করে, আমি তার জন্য অবশ্যই ***সহজ করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।***

(৯২: ৫-১০)

শক্তি আসে একমাত্র সত্য থেকে। কেউ তাকে মিথ্যা বললে বা খারাপ পথে ব্যবহার করলে সেই শক্তিই তাকে ধ্বংস করে। তোমার দেশে অনেক কোরআনের শিক্ষকই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। **এজন্য কোরআন শেখার আগে জানতে হয় কোরআন কেন শিখতে হবে। কোরআন কেন অবতীর্ণ হলো এ ব্যাখ্যায় গোটা কোরআন ভরপুর। সুতরাং প্রথমে কোরআনকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে হবে। তারপর কোরআন থেকেই তার জবাব নিতে হবে।** প্রথমে খারাপ কাকে বলে এবং কেন তা খারাপ তা জানতে হবে।

> আর এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এবং এতে অপরাধীদের পথও (ক্রিয়াকাণ্ডও) সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
>
> (৬: ৫৫)

খারাপকে জানার প্রয়োজন না হলে কি আর আল্লাহ আমাদেরকে তা জানাতেন? তাকে প্রথমত ধর্মের বাইরে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে শিখতে হবে। নইলে আকস্মিকভাবে খারাপ এসে তোমাকে আক্রমণ ক'রে অভিভূত ক'রে ফেলবে। ইংরেজি শব্দটাই এখানে ফলপ্রসূ এবং ইঙ্গিতবহ—'তুমি ওভারওয়েল্‌ম্‌ড্‌ হয়ে পড়বে।'

'যদি জানতে পারতাম মন্দের রহস্য।'

'অল্প কথায় সম্ভব নয়। পরে কোনো দিন।'

'আমার দেশটাকে আমি ভালোবাসি, গুরুজী কিন্তু....।'

'তোমার দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, মানুষ ক'মে যাচ্ছে।'

'আপনার এখানে কিছু করার আছে?'

'মাঝেমধ্যে সহ্য না করতে পেরে ভাবি যে চিৎকার করে উঠি। কিন্তু পরক্ষণে থেমে যাই। তাতে যাদের মঙ্গল চাই তাদেরই ক্ষতি হবে।'

'জ্বী, গুরুজী। আপনি চিৎকার ক'রে উঠলে পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও এটা পাহাড়ী দেশ না।'

'তখন পাহাড়-ভাঙা টুকরো পড়বে আমার প্রিয় দেশবাসীর মাথায়।'

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তো পাহাড়কেও তুলো তুলো করে দেবেন, তাই না গুরুজী?'

‘কিছুকে তুলো তুলো করবেন, কিছুর ঘাড় বেশি উচু ব’লে তা সমতল করবেন, কিছুর আবার পা টলিয়ে দেবেন। কোরআনের বাণী শোনোঃ

> আর তোমাকে [হে মুহাম্মদ (সঃ)] পর্বতমালা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাওঃ আমার রব সেগুলো সমূলে উৎপাটন ক’রে উড়িয়ে দেবেন।
>
> (২০: ১০৫)
>
> সে দিন....জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে উড়ন্ত ধূলিরাশির মতো।
>
> (৭৩:১৪)
>
> সজোরে আঘাতকারী মহাপ্রলয়।
>
> কী সেই মহাপ্রলয়?
>
> মহাপ্রলয় কী, তুমি কি জান [ হে মুহাম্মদ (সঃ)]?
>
> সেদিন মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো হয়ে যাবে [নেতৃত্বহীন, বন্ধনহীন]।
>
> এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো [গুড়িয়ে যাবে নেতৃত্ব]।’
>
> (১০১: ১-৫)

‘গুরুজী, আমার বুকে কষ্ট।’

‘কাঁদতে চেষ্টা কর।’

‘পানি নেই।’

‘আঘাত খোঁজ।’

‘আঘাতে আঘাতে জর্জরিত।’

‘তবুও পানি হচ্ছে না?’

‘কারণ যে আঘাত পাচ্ছি তার অর্থ বুঝতে পারছি না।’

‘আঘাতের অর্থ বুঝতে না পারা খুব কষ্টের। অর্থ বুঝতে পারলে আঘাত আর আঘাত থাকে না।’

‘আমার বাংলায় শিশু ধর্ষণ হয়।’

‘বিষয়টার আলোচনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান হলো..... ।’

‘আদালত?’

‘না, মসজিদ।’

‘কিন্তু অধিকাংশ মসজিদে তো শুধু দোয়া করা হয়। প্রচুর টাকা পয়সার দোয়া। রোগমুক্তির দোয়া।’

‘অথচ মসজিদের মতো পবিত্র আদালতে ব’সে এসব অপবিত্রতার সামাজিক ফয়সালা এবং নিন্দা প্রচার ও চেতনাসৃষ্টির কাজ হওয়া উচিৎ। মনের রোগই বড় রোগ। আল্লাহ্ দেহের রোগকে সৃষ্টি করেন মনের রোগ সারার জন্য—এ কথা সব বিশ্বাসী ডাক্তার এবং রোগীর এবং দোয়াকারীর জানা উচিৎ।’

‘গুরুজী, আমার বুকে ব্যাথা।’

‘আঘাত কর।’

‘আমার বাংলার অনেক মানুষ শিক্ষিত হলে বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক স্বভাবের হয়ে যায়।’

‘আমি মানুষ ভালোবাসি। তুমি আমাকে পশুর কথা বল না। ওরা তওবা না করলে আল্লাহ্র সাথে ওদের ব্যবসা লোকসানের হবে।’

‘ওরা স্বপ্নের মধ্যে আছে।’

‘ওদের স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়, যেমনভাবে আমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকেছিলে।’

‘কিন্তু ওদের স্বপ্নগুলো নিউইয়র্ক শহরের মতো ব্যস্ত। নাচ গান মদ্য উল্লাস। ভারত কালচার। হিন্দি টপ থাউজেন্ড্। আধুনিকতা। প্রেমের নামে দেহের কিনারায় জলডুবি। পশ্চিমবঙ্গের বই পড়া নাস্তিকতা।’

গুরুজী শক্ত হয়ে ব’সে রইলেন। হাতের কাঠখণ্ডটা ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকালেন। বুড্ডা ঘুরে তাঁর সামনে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে দেখল যে তাঁর চোখে পানি। তিনি হয়তো ভাবছেন তিনি চোখ দিয়ে পানি ফেলবেন নাকি রক্ত। বুড্ডা আকাশ ফাটিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চিৎকার ক’রে উঠল—‘গুরুজী আমার বুক ভরা কষ্ট!’

গুরুজী ধীরকণ্ঠে চোখের পানিকে অবাধে ঝ'রে যেতে দিতে দিতে বললেন—'মুসলমানের কষ্ট না পাওয়া হারাম। কাফেররা ইমান আনছে না দেখে রসূল (সঃ) কষ্টে আত্মহত্যা করার পর্যায়ে চ'লে গিয়েছিলেন। কোরআনেই আল্লাহ্ একথা বলেছেন (আয়াত ২৬:৩)।'

'গুরুজী, আমার দেশের অনেক মুসলমান ভোট বিক্রি করে।'

'যারা কেনে তাদের কথা চেপে যাচ্ছ কেন?'

'গুরুজী, আমার প্রিয় বাংলায় লাশের রাজনীতি চলে।'

'ওরা ভুলে গেছে যে ওরাও ভবিষ্যতের হাতে লাশমাত্র'—দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীর কণ্ঠে বললেন গুরুজী।

'ধর্ম নিয়ে ব্যবসা হয়।'

'সুদে-আসলে ফল পাবে', বললেন গুরুজী।

'এখানে রাজনীতির প্রধান স্ট্যাটিজি হলো মিথ্যে কথা আর হিংসা।'

'নিজের দিকে ফিরে আসবে।'

'এখানে নেতৃত্বের প্রধান স্ট্রাটিজি হলো মিছে প্রতিজ্ঞা আর বাহুবল আর স্বজনপ্রীতি।'

'ওদের স্বজনরাই পর হবে, বাহু শেকলমুক্ত থাকবে না, প্রতিজ্ঞাগুলো ভঙ্গ হবে।'

'এখানে দশ টাকার জন্যেও মানুষ মানুষকে খুন করে।'

'মানবজাতির মধ্যে এটা স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু বিচার না হওয়াই অস্বাভাবিক।'

'গুরুজী, এখানে রক্ষকই ভক্ষক। পুলিশ রহস্যময় হয়ে গেছে।'

'আল্লাহ্ পরম রহস্যময়। তিনি মানুষের কৌশলের মধ্যে অবস্থান ক'রেই তার কৌশলকে তার কাছে ফেরত দেন। কোরআনে বলা হয়েছে:

> আর তারা কৌশল করেছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

(৩: ৫৪)

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য S. M. Zakir Hussain এর *Concept of Generic Business Strategies in the Quran* দেখে নিও।'

'গুরুজী, আমি আমার বাংলাকে ভালোবাসি।'

'তোমার চেয়ে ওরাই বেশি ভালোবাসে যাদের কথা তুমি বলছ।'

'এখানে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না।'

'আল্লাহ্ পরকালে ঘুষ গ্রহণ করবেন না।'

'গুরুজী, **বাংলার মুসলমান জামাতে নামাজ পড়ে কিন্তু জামাতে জীবন যাপন করে না**। কেউ তার পড়শিকে চেনে না। বাড়িওয়ালা এখানে ভাড়াটিয়ার বস্। সবাই নিজের মতো নিরিবিলি থাকে। সুন্দরী মেয়েরা শ্বশুড়-ননদ বিহীন একাকী নিরিবিলি, সুখী সংসার চায়। **মানুষ এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।'**

**'অধিকাংশ মানুষ দল বেঁধে নামাজ পড়লেও প্রত্যেকে মনে করে যে তার জন্য আলাদা আলাদা বেহেস্ত আছে। প্রত্যেকের সাথে একটা সুড়ঙ্গ আছে যা দিয়ে সে চুপিসারে নিজের মতো ক'রে বেহেস্তে ঢুকে পড়বে। অথচ এমন কোনো বেহেস্ত আল্লাহ্র রাজ্যে কোথাও নেই। বেহেস্তে সবাই মিলেমিশে থাকবে—এ কথা কোরআনে বলা হয়েছে—এখানেও সবাইকে মিলেমিশে থাকতে বলা বলা হয়েছে'**।

'গুরুজী, আমার প্রিয় বাংলার মানুষ অসহায়।'

'কিন্তু ওরা আল্লাহ্কে ভয় পাচ্ছে না। ডাকছেও না। অপেক্ষাও করছে না।'

'গুরুজী, এই বাংলার মানুষের জন্য জীবন দিতে ইচ্ছে করে।'

'ওরাও তোমার জীবনটা নেয়ার জন্য প্রস্তুত।'

বুড্ডা হঠাৎ থেমে গেল। খানিক পর দ্বিগুণ চিৎকার ক'রে উঠল—'গুরুজী, বাংলাদেশকে আমি ভালোবাসি। আমার বুকে অনেক কষ্ট।'

'আমারও।'

তারা গুরুশিষ্য সশব্দে কাঁদতে কাঁদতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। হয়তো বা তাতে তাদের বুকের ব্যাথাটা কিছুটা কমল।

তের

## জীবনের ছোঁয়া

রাতে বুড্ডা গুরুজীর সাথে মোরাকাবায় ব'সে আছে। গভীর রাত। সে মাঝে-মধ্যে মোরাকাবায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে তা মোরাকাবা না হয়ে হয়ে যায় রিল্যাক্সেশন। এরূপ ঘুমে গাদা গাদা স্বপ্ন আসে। সে একটা ভয়ংকর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা সহ্য না করতে পেরে চিৎকার ক'রে জেগে উঠল—'চোর! চোর!'

'কী হয়েছে, বুড্ডা?' গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন।

'গুরুজী, চোর।'

'কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'ঘর থাকলে তো চোর আসবেই। ঢুকলো কিভাবে?'

'ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।'

'এ জন্যেই সে এসেছিল। খোলা থাকলে আসত না।'

'মানেটা একটু পরে বুঝতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে।'

'চোররা কেবল সেই ঘরেই ঢোকে যার দরোজা বন্ধ থাকে।

> আর নিশ্চয়ই নূহের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম। স্মরণ কর, তিনি তার রবের কাছে **সুস্থ হৃদয়ে** এলেন।

(৩৭: ৮২-৮৪)

তাঁর হৃদয়টা আগে বন্ধ ছিল—তিনি চন্দ্র-সূর্যকেও সিজদা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে পথ দেখানোর পর তাঁর হৃদয়ের আবদ্ধতা দূর হলো এবং তিনি মুক্ত-হৃদয় হলেন সুতরাং ঘরের দরোজাগুলো খোলা রাখ—মনটাকে আল্লাহ্‌র দিকে খুলে রাখ।'

'গুরুজী সুন্দর বলেছেন। এক স্বপ্নের মধ্যে তিনবার চোর এসেছিল।'

'মানে তুমি তিনবার ঘুমিয়েছিলে? তাও স্বপ্নের মধ্যে! তুমি তো দেখেছি চোরের চেয়েও বোকা।'

‘জ্বী, চোর ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে না।’

‘দরোজা বন্ধ রেখ না। তাহলে চোর আসবে না।’

‘গুরুজী, দ্বিতীয়বারের ঘুমের আগে দরজা খোলাই রেখেছিলাম। ঘরে ঘুম আসছিল না। প্রচণ্ড গরম ছিল। তাই বাইরে শুয়েছিলাম। কিন্তু মাঝরাতে উঠে দেখি দরোজা বন্ধ।’

‘ভেতর থেকে নাকি বাইরে থেকে।’

‘ভেতর থেকে।’

‘তার মানে চোর শুয়েছিল তোমার ঘরের মধ্যে আর তুমি শুয়েছিলে বাইরে?’

‘কিন্তু সে এপাশের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ ক’রে ওপাশের দরোজা দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।’

‘ওর উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে ঘরের ব্যাপারে চিন্তিত রাখা।’

‘কেন যে কঠিন কথা বুঝতে দেরি হয়।’

‘সহজ করে বলছি। তোমার ঘরে কী ছিল?’

‘শুধু আমি। নেয়ার মতো আর কিছু না।’

‘চোরের কাজ হলো তোমাকে কেবল ঘর-সচেতন ক’রে রাখা। সে চায় যে তুমি সারারাতদিন কেবল ঘরেই থাক। বাইরে বের না হও। কারণ সে হলো তোমার শত্রুর বন্ধু। তোমার শত্রু চায় তোমাকে ঘরমুখো ক’রে রেখে একা সারাজগৎ জয় ক’রে নিতে।’

‘তিনদিন পরও আপনার কথা অস্বীকার করতে পারব না। কারণ আমি যখন ঘরকে তুচ্ছ জ্ঞান ক’রে পরদিন সবগুলো দরোজা খোলা রেখে শুয়ে আছি, তখন দেখলাম শত্রু এসে আমার ঘরে একটা মূল্যবান জিনিস রেখে গেল। আমি আর বাইরে শুয়ে থাকতে পারলাম না। ঘরের প্রতি আমার টান বেড়ে গেল। সুতরাং আমি তড়িঘড়ি ক’রে উঠে ঘরে চলে গেলাম। কিন্তু ঘরে গিয়ে শান্তিতে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারলাম না। দরোজার বাইরে চোর আনাগোনা করতে লাগল। ঘরে দামী রত্ন থাকলে চোররা ঘুমাতে দেয় না। একদিকে চোরের চিন্তা, একদিকে মূল্যবান রত্নের চিন্তা।’

‘ঘরমুখো চোরগুলো খুব খারাপ। ছুঁচো ইদুরের মতো বেহায়া। হায়া লজ্জা কিছু নেই।’

‘তাহলে এখন কী করা?’

‘হুম! সমস্যাটা তো খুব জটিল দেখছি। বাসা চিনে ফেলেছে।’

‘গুরুজী, বাসা পাল্টাই?’

‘লোক চিনে ফেলেছে।’

‘মাই গড! সাপ হলে তো খোলস পাল্টাতে পারতাম।’

‘তোমার চোর কিন্তু খোলস পাল্টাতে জানে। ছয় ঋতুতে ওর ছয় রূপ। ওকে চিনলেও তোমার কোনো লাভ নেই। তোমার আজকের চেনা আগামীকালের অজ্ঞতায় পরিণত হতে সময় লাগে মাত্র ২৪ ঘন্টা।’

‘জ্বী, দুঃখজনকভাবে সময়টা আরো কমে আসছে। এখন আরো দ্রুত ভুল ক’রে ফেলি।’

‘তারও কারণ আছে। সাধক মাত্রেরই এই সমস্যাটা একটা বড় সমস্যা। তবে এর ব্যাখ্যা অল্প কথায় দেয়া সম্ভব না। যাহোক, আবার ঘুমাও। এবার চোরের ঠিকানাটা জোগাড় করে আমাকে বল।’

বুড্ডা আবারও মোরাকাবার নাম ক’রে ঘুমিয়ে পড়ল। সে স্বপ্নে দেখল যে তার একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেখানে সে একা থাকে। সেই ঘরে আছে একটা অতিমূল্যবান রত্ন। সে স্বস্তিমতো ঘুমাতে পারে না। তার মন প’ড়ে থাকে রত্নের মধ্যে। কিন্তু আজ তার দায়িত্ব আছে। আজ তাকে রত্নের দাবি ছাড়তে হবে। চোর যদি তা নিয়ে যায় তাহলে তাকে তা নিতে দিতে হবে। তার পিছু নিতে হবে। তার ঠিকানা না হলে তাকে ঠেকানোর জন্য ঠিকমতো তাবিজ করা যাচ্ছে না। সুতরাং সে চোরের কথা চিন্তা করতে লাগল।

চোর কখনও গৃহস্থের বেশি সময় নষ্ট করে না। টাইম ম্যানেজমেন্ট পৃথিবীতে চোরেরাই প্রথম শিখেছিল। চোর দরজার কাছে আসার সাথে সাথে বুড্ডা উত্তেজনা ও ভয়ে ব’লে ফেলল—‘কে ওখানে?’

‘এই তো আমি!’ সে সাথে সাথে আহলাদে গদগদ হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

‘আমি মানে?’

'আমি মানে আমি। না ডাকলে লুকিয়ে থাকতাম।'

'তুমি কী চাও?'

'তুমি আলাদিন। আমি তোমার জ্বিন। তুমি আমার কাছে যা চাইবে আমি তোমাকে তা এনে দেব।'

'কিন্তু তুমি না চোর?'

'ওসব গালগল্প। আমি তোমার বন্ধু। শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। আমি দূরে থাকাকালীন তুমি আমাকে ভয় পেতে ব'লে আমাকে সন্দেহ করতে। আর তোমার সন্দেহের সুযোগ নিয়ে তোমার গুরু আমাকে তোমার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আমাকে ছুঁয়ে দেখ, দেখ তো আপন ব'লে মনে হয় কি না?'

'ও মা! চোরের গায়ে এত উষ্ণতা! আগে জানতে পারিনি যে।'

'বন্ধুকে চোর বলা মোনাফেকি।'

'তুমি কী চাও?'

'তোমার আবার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া কিসের? আমি তোমার জন্য পৃথিবীর যে কোনো সম্পদ চুরি ক'রে এনে তোমাকে দেব। শুধু আদেশ কর।'

'তোমার নামটা কিন্তু বলনি।'

'আমি হলাম....এই আমি। মানে আমি আর কি।'

'হুম বাড়ি কোথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে চোর দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বুড্ডাও তার পিছু নিল। চোর ঘরের বাইরে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বুড্ডা দেখল যে একই চোর দুই রঙের দুটো চোরে রূপান্তরিত হয়ে দু'দিকে ছুটে চ'লে গেল—একজন পূর্বদিকে, একজন পশ্চিমদিকে। সে কার পিছু নেবে? সে অত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। এদিকে গুরুজীর আদেশ—তাকে চোরের ঠিকানা বের ক'রে আনতে হবে। সে চিৎকার ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল যে তার পেছনেই চোর দাঁড়িয়ে আছে—সে বুড্ডাকে ছুঁয়ে আছে।

'কোত্থেকে এলে?'

‘ডাকলেই আসি।’

‘কোত্থেকে এলে?’

‘তুমি তো গেলে না।’

‘কোনদিকে যেতে পারতাম?’

‘না গেলেও তোমার সাথে আছি।’

‘কোথায় যাচ্ছিলে?’

‘দূরে আর যেতে পারলাম কই।’

‘স্টপ! আমি তোকে শেষ ক’রে দেব।’

গুরুজী বললেন, ‘উত্তেজিত হয়ে কোনো লাভ নেই। ও তোমার উত্তেজনার মধ্যেই রয়ে গেছে।’

বুড্ডা কেঁপে উঠল। ‘এখন কী করা গুরুজী?’

‘ও তোমার হতাশার মধ্যেই আছে।’

বুড্ডা কেঁদে ফেলল।

‘ও তোমার দুঃখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।’

বুড্ডা চুপ হয়ে গেল। মাথা নিচু ক’রে গুরুজীর সামনে ব’সে রইল। গুরুজী বললেন—আনুগত্যের বা আত্মসমর্পণের মধ্যে ঢোকার যোগ্যতা ওর নেই।

বুড্ডা আশ্বস্ত হলো। বলল—‘হাসবুন আল্লাহু নি’মাল ওয়াকীল—আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।’

‘তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্-নির্ভরতার মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার ওর নেই।’

বুড্ডা বলল—আ’উজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম—আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’

গুরুজী বললেন, ‘আল্লাহ্ভীতি বা তাকওয়ার মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার ওর নেই।’

বুড্ডা চুপ ক'রে রইল।

গুরুজী বললেন—'তোমার আশা-আকাঙ্খা, লোভ, হতাশা, ক্রোধ, হিংসা, রিয়া, অহংকার—এগুলো হলো তোমার চোর—একই চোরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ওরা এমন ভাব দেখায় যে ওরা যেন তোমার জ্বিন আর তুমি আলাদিন। তুমি যা চাইবে ওরা তোমাকে তা এনে দেবে। তুমি রত্ন চাও, বস্তু চাও, লোহা-লক্কড়, কাগজ, আটার দলা, মাংসের দলা—এসব চাও। লোহা--লোক্কার আর গাড়ি বাড়ির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? কাগজ আর টাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? ভালো ভালো খাবার আর আটার দলার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? পাশবিক যৌবন আর মাংসের দলার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? টিকে থাকার জন্য এবং ভালো থাকার জন্য এগুলো যতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন পৃথিবী থেকে ততটুকু গ্রহণ করাই একজন জ্ঞানী মানুষের কাজ। আল্লাহ্ যদি তোমাকে নিজ করুণায় অঢেল দেন, তো বেশ। ভোগ কর। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের হকও আদায় কর। কিন্তু মনটাকে এসবের মধ্যে ফেলে রাখবে কেন? আশা-আকাঙ্খা তোমার মনকে এসব বাহ্যিক বস্তুর সাথে দড়ি বেঁধে রেখেছে। এসব বস্তু রয়েছে তোমার কল্পনায়, কারণ তুমি সেগুলোকে এখনও পাওনি—পাওনি বলেই তো তুমি চাও। আর কল্পনা মানে হলো ভবিষ্যৎ। সুতরাং চোরের একটা ঠিকানা যে অজানা ভবিষ্যতে বা পশ্চিম দিকে একথা এখন বুঝলে? কেন এই আশা-আকাঙ্খা? কারণ হলো লোভ। লোভ মানুষকে অতীত থেকে ঠেলে ভবিষ্যতের দিকে চালিত ক'রে। অতৃপ্ত ক'রে তোলে। না-শোকর ক'রে তোলে। শুধু লোভ নয়, হতাশাও এর জন্য সমান দায়ী। যে নিজেকে হতাশ মনে করে, এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর না ক'রে বস্তুর ওপর নির্ভর করে, সে হতাশা থেকে রেহাই পাবার জন্য আশা-আকাঙ্খার দাস হয়ে যায়। অতীতের তৃপ্তি তোমাকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করে। বর্তমানে এক দণ্ডও দাঁড়াতে দেয় না। অতীতের আক্রোশ তোমাকে ভবিষ্যতের প্রতিশোধের দিকে চালিত করে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা আক্রোশে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ তোমার চোরের একটা ঠিকানা হলো অতীত। তাহলে তোমার বর্তমানটা কী? পৃথিবীর খুব কম লোক এই বর্তমানের রহস্যটা জানেন। সুতরাং মন দিয়ে শোনো। আনুগত্য ও প্রেমের সাথে শোনো। এবং সেই সাথে হাতে-গোনাদের মধ্যে একজন হয়ে যাও। মানুষের হাতের আঙুল বাড়বে না বটে, তবুও সত্যকে জানার লোক একজন বেড়ে গেলে গুনতে তেমন সমস্যা হবে না। অধিকাংশ লোকে ঠিকমতো গুনতেই জানে না। সুতরাং গোনার সময়ে তাদের আঙুলে কম পড়ল কি-না

তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যারা গুনতে জানে, সত্যাদর্শীদেরকে গোনার সময়ে আঙুলে কম পড়লে তারা খুশিই হয়।'

একটু থেমে গুরুজী বললেন—'বল, তোমার বর্তমানটা কী?'

বুড্ডা গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। খানিক পরে সে বলল—'কেউ জানে না।'

'ঠিক বলেছ। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে তারা বর্তমানের মধ্যে বেশ মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ্‌র কসম! মানুষ তাই মনে করে। যে কারণে মানুষ জীবনের 'প্রতিষ্ঠা'র কথা বলে। প্রতিষ্ঠা মানেই তো বর্তমানের ওপর একটা শক্ত ভিত। তোমার অভিধান বা ডিকশনারি যদি একথা না বলে তাহলে তাকে পাল্টে ফেলতে বল। অনেক গোছগাছ 'বাস্তবতা' এলোমেলো হয়ে যাবে ভয়ে আমি অনেক সত্য কথাই গোপন রাখি। আল্লাহ্‌র দাসদের কাজ মানুষ তথা মখলুকের জীবনকে সহজ করা, জটিল করা নয়। বর্তমানকে কেউ দেখাতে পারবে না। যদি কেউ বলতে চায়—এই তো আমার বর্তমান, তাহলে সে বড়জোর একটা বিল্ডিংকে দেখিয়ে দেবে, একটা দামী গাড়ির গায়ে হাত বুলাবে, ব্যাংকের একাউন্ট নাম্বারটাকে বারবার জপ করতে থাকবে, তেল চুকচুক পেটে একটু ঘি মালিশ ক'রে দেখাবে, তিনটা ছেলে আর লন্ডনে একা বসবাসরত একটা মেয়ের সুন্দর নামগুলো উচ্চারণ করবে, টাইম ম্যানেজমেন্টের চার্ট দেখাবে, একগাদা লোকের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে চারজন লোকের ঘাড়ের ওপর কুৎসিত বুট রেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে তর্জনীটা উচু ক'রে ধ'রে গাল থেকে স্টীমারের মতো বাষ্প বের করতে করতে বলবে—ভাইসব! কিংবা পাটকাঠির মতো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে করুণ গলায় বলে উঠবে—আমি কি আর আছি ভাই? সব দোষ আল্লাহ্‌র। —যে বলতে চায় যে সে বর্তমানটা পেয়েছে তার চোখ আসলে বস্তুর দিকে। বস্তু পরিবর্তনশীল। বস্তুর প্রবাহের গতি অনির্দিষ্ট। ফলে সে ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত। ফলে তার মন প'ড়ে আছে ভবিষ্যতে। ফলে **তার বর্তমান কাটছে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্ল্যান করতে করতে**। সম্ভব হলে সে টাইম মেশিনে ক'রে কিছু পুলিশ পাঠিয়ে দিত আর ভবিষ্যতের সহায় সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্য।

**যে বলে যে সে তার বর্তমানকে হারিয়েছে সে আসলে আক্ষেপ করছে তার অতীত নিয়ে আর হতাশ হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্তমানকে সে না দেখেই তাকে গালগালি করা শুরু ক'রে দিয়েছে।**

বুড্ডা, আমার কথা শোনো। অন্যদেরকেও আমার কথা শুনিয়ো। তাদেরকে ব'লো যে আমি তাদেরকে ভালোবাসি। নিজের চেয়েও। আমি বেঁচে আছি কেবল তাদের জন্যই—তারা জানুক বা না জানুক। অজ্ঞরা জীবদ্দশাতে যা না জানে, মৃত্যু তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়। সুতরাং তুমি মানুষকে বলে দিয়ো যে আমি নিজের মতবাদ প্রকাশের জন্য কোনো কথা বলি না। আমি জানি ওরা কারা আর কে আমি। তাই তো আমি নিজের চেয়েও ওদেরকে বেশি ভালোবাসি। সুতরাং আমি যা বলছি, তাদের মঙ্গলের জন্যই বলছি। আমার মঙ্গল শুধু এটুকু যে আমি ভালোবাসতে পারলাম, আল্লাহ্ আমার মধ্যে তাঁর প্রেমের বৈশিষ্ট্যটাকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা কাজে লাগাতে পারলাম। সুতরাং আমাকে কেউ যেন হিংসা না করে। আমার কথায় কারো যেন অহংকার জেগে না ওঠে। তাহলে সে নিজেই নিজের ভেতর শুকনো খেজুরের ডগার মতো বেঁকে ঢুকে পড়বে। আর বের হয়ে আসতে পারবে না। আমি এক শক্তিশালী অস্ত্রধারী লোক। আমার একমাত্র অস্ত্র হলো প্রেম। সাবধান!

তোমার কল্পিত বর্তমানটাই হচ্ছে তোমার সেই ছোট্ট কুঁড়েঘর। ওকে তুমি অত্যন্ত বেশি ভালোবাস। অথচ তোমার ঘর ভরা অতীতের গো-ভাঁগাড়ের আবর্জনা আর ভবিষ্যতের মিছে-মায়া। এই হলো তোমার বর্তমান। হায় হতভাগা! আমি যদি তোমাকে বলি—আমাকে তোমার অতীত দেখাও তো? তুমি দিব্যি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া পাওয়ার ইতিহাসের লম্বা তালিকা তুলে ধরবে। বাহ! বেশ তো নিজের জীবনের ইতিহাস লেখা শিখেছ। বায়োডাটা! **তাতে যা কিছুকে তুমি ভালো বা অনুকূল ব'লে মনে কর তা তোমার অহংকার বাড়িয়ে দেয়, আর যা কিছুকে তুমি অনাকাঙ্খিত ব'লে মনে কর তা তোমার আকাঙ্খা বাড়িয়ে দেয়। একটা তোমাকে অতীতের দিকে টেনে রাখে আর একটা তোমাকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে পাঠায়।** তুমি তো সরষের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের ওপর তোমার নিজেরই কোনো ভরসা নেই। বর্তমান তোমার কই? তোমাকে যদি বলি—আমাকে তোমার ভবিষ্যৎ দেখাও—তো তুমি এমন সব প্ল্যান-প্রোগ্রামকে সুন্দর সুন্দর ছক ম্যাট্রিক্সে সাজিয়ে আমার সামনে এনে হাজির করবে যার অধিকাংশ বিষয়বস্তু ও দিক-নির্দেশনা এসেছে অতীত থেকে আর কিছু এসেছে তোমার সহজাত স্বপ্নবিলাসিতা থেকে। মানুষের স্বপ্ন না থাকলে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, তথা মানবীয় বিকাশ (development) ঘটত না। **ছোট্ট শিশু ঘর-ঘর খেলে। স্বামী-স্ত্রী খেলে। বাবা-মা খেলে। এর কারণ কী? কারণ সে নিজের অজান্তেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তার মধ্যে ফুটে**

**ওঠার সুযোগ দেয়। সে নিজে হলো সব ভবিষ্যতের ভিত। সুতরাং ভবিষ্যৎ-মুখিতা মানব অস্তিত্বের একটা স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল। এই অর্থে তা খারাপ নয়। কিন্তু যেই তুমি জানতে পারলে যে তা কৌশলমাত্র, অমনি তুমি জ্ঞানী হয়ে গেলে। কৌশলকে দাস বানালে, তার দাস হলে না। তখন তুমি খুঁজতে থাকলে সেই ভিত বা ব্যাক্‌গ্রাউন্ডকে যা চিরস্থির, যার ওপর ছায়াছবির মতো আপতিত হচ্ছে অতীত আর ভবিষ্যতের গোটা সাজানো নাটক। তখন তুমি নিজে অভিনেতার পাঠ ত্যাগ ক'রে ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেলে। সব চমৎকারভাবে উপভোগ করলে অথচ কিছুই তোমাকে ছুঁতে পারল না। তুমি মুক্ত হয়ে গেলে। চিরমুক্ত। অনন্তকালের জন্য মুক্ত।**

আল্লাহ্‌র কসম! **বর্তমান মানেই সেই ব্যাকগ্রাউন্ড। এ কারণে বর্তমানকে পায় খুব কম লোক। তার প্রমাণ রয়ে গেছে তোমার বর্তমানমুখী হওয়ার চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যে।** নামাজ হলো এই মহাপটভূমি বা 'সুপারগ্রাউন্ডের' সাথে মিলনের অনুষ্ঠান। সুতারাং আয়োজন ক'রে, অনুষ্ঠান ক'রে নামাজ পড়। অজু আর তওবা হলো শ্রেষ্ঠ আয়োজন। তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং ভীরু আশা ও নম্রতা হলো সেই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পোশাক।'

বুড্ডা বলল—'কিন্তু আমার ঘরে আমার শত্রু যে রত্ন রেখে গেল, ওটা?'

'ওটা হলো তোমার ঘরটার অস্তিত্বের অর্থ বা তাৎপর্য। তুমি ঘরটা চেয়েছ কেন? নিশ্চয়ই তোমার কাছে মূল্যবান কিছু আছে যা নিয়ে তুমি সুখী হতে চাও। তাই না? তোমার গোটা আশ আকাঙ্খার সাথে তোমার ভালোবাসা এবং অঙ্গীকার যুক্ত হয়ে রত্নটাকে নির্মাণ করেছে।'

'তাহলে তো ঘরটারই কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'নেই তো। তুমি যতক্ষণ তাকে তোমার অস্তিত্বের সমতুল্য ব'লে মনে করবে, ততক্ষণ আমি বলব যে তা অর্থহীন। কারণ তুমি ছায়াকে মূলবস্তু ভেবে নিয়ে তার গায়ে হাত বুলাচ্ছ। আবার তুমি যদি মায়াকে মায়া বল, তাহলে আমি বলব যে তা সত্য। কারণ মায়াতো *সত্য সত্যই* মায়া, নয় কি? মায়ারও তো স্রষ্টা থাকা চাই। মায়াকে যদি সত্য দ্বারা সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে সত্যকে ধারণকারী জ্বিন ও মানবকে তা কিভাবে বিভ্রান্ত করতে পারত? কাজেই 'মায়া' কথাটা উচ্চারণ ক'রে অন্যান্য ধর্মের বৈরাগীদের মতো বনে চ'লে গিয়ে একা সুখী হয়ো না। সমাজের মায়ার ধোঁয়াজালকে কাটার দায়িত্বও তোমার। অবশ্য সত্যে স্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্জনে থাকার কোনো বিকল্প নেই। সত্যকে জানার আগে যারা লাফালাফি শুরু ক'রে

দেয়, নিজে শেখার আগে শেখানো শুরু ক'রে দেয়, তারা হয় অহংকারী হয়ে ওঠে, না হয় নির্দয় কট্টরপন্থী না হয় হিংসুক, না হয় ধর্মব্যবসায়ী। সত্যের চরিত্রই এমন যে তা অপূর্ণাঙ্গতাকে কেটে ফালা ফালা ক'রে দেয়। দলে দলে বিভক্ত ক'রে দেয়। ঠিক যেমন নামাজ তোমাকে ভাগে ভাগে টেনে ছিড়ে আলাদা ক'রে দেয়। এই কারণে পরকালে মহাসত্যের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অপূর্ণাঙ্গ মানুষ ধারাবাহিকভাবে মিলতে পারবে না ব'লে দলে দলে ভাগ হয়ে পড়বে। একই কারণে সত্য ধর্মকে মানুষ বিভক্ত ক'রে ফেলতে চায়। অপূর্ণাঙ্গতার চরিত্রই হলো বিভক্ত হয়ে পড়া। ঐক্য মানে পূর্ণাঙ্গতা। আল্লাহ্ আমাদেরকে জামাতে নামাজ পড়তে শুধু বলেননি, জামাতে জীবনযাপন করতেও বলেছেন। অথচ আজ দেখা যায় এক মুসলমান টুপি মাথায় তসবিহ্ হাতে দাঁড়িয়ে দেখছে যে সন্ত্রাসীরা অন্য মুসলমানকে চাঁদা না দেয়ার অপরাধে হাত কেটে দিচ্ছে বা গুলি করছে, এবং কেউ এগিয়ে আসছে না। মৃত্যুর সময়ে এসব মুসলমানিত্বের ধার কতখানি তা ধরা প'ড়ে যাবে। সবাই মৃত্যুকে ভয় কর। কেউই আল্লাহ্কে ভয় করে না। আল্লাহ্ বলেছেন—তোমরা **শুধু আমাকেই** ভয় কর।

মনে রাখবে, অসম্পূর্ণতা নিয়ে তুমি যদি বাসা পাল্টাও, স্থান পাল্টাও, ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়েও আশ্রয় নাও, তবুও তোমার অসম্পূর্ণতা তোমার সাথে সাথে যাবে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা জানেন ব'লে তিনি মসজিদে ব'সে জাগতিক কথাবার্তা বলাকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ হলো বাহ্যিক বিধান, কিন্তু যারা বাইরের বিধান মানল লোক দেখানোর জন্য বা শাস্তির ভয়ে কিন্তু মনের মধ্যে ঘরটাকে নিয়ে মসজিদে ঢুকল, তাদের কী হবে? তাদের ব্যাপারটা শরীয়ত দ্বারা বিচারযোগ্য নয় ব'লে তার সাক্ষী একমাত্র আল্লাহ। তারা এভাবে মুক্তি পাবে না। অসম্পূর্ণতা থেকে এমনভাবে পালাতে হবে যেন তা তোমার পিছু নিতে না পারে। তাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করতে হবে, পিছু ফিরে তাকানো যাবে না। ঠিক যেমন আল্লাহ্ লূত (আঃ) কে বলেছিলেন—তোমার স্ত্রীকে পেছনে ফেলে পালিয়ে যাও এবং পেছনে ফিরে তাকিয়ো না। ইসলামে ঘরত্যাগী আল্লাহ্র অলীগণ এই কল্পনার ঘরকে ত্যাগ করেন, সমাজকে নয়। এই মায়া ত্যাগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তারা সমাজে ফিরে এসে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য কিছু সৌভাগ্যবান লোক আছেন যারা আক্ষরিক অর্থে কখনও ঘর ত্যাগ করেননি, অথচ আল্লাহ্ তকদিরের কৌশল দ্বারা তাদের মনকে ঘর থেকে বের ক'রেই তাদেরকে ঘরে ফেলে রেখেছেন। ফলত তাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানলাভ ঘটেছে সমাজের মধ্যেই। ফলে তারা শরীয়ত মারেফত উভয়ের মিলিত রূপে সত্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে

দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এই অর্থে মুসলমানের জন্য সন্ন্যাস বৈধ এবং একই সঙ্গে অবৈধ। খাঁটি মুসলমান সমাজ ত্যাগ না ক'রেই খাঁটি সন্ন্যাসী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম সংসারবিরাগী হলেন চিরঞ্জীব মানব, হায়াতুন্নবী মুহম্মদ (সঃ)। আল্লাহ্ তাঁকে পৃথিবীর চাবি দিয়েছেলেন। তিনি তা গ্রহণ করেননি। আমার প্রিয়তম দিনের পর দিন অনাহারে থেকেছেন। অথচ আমার পেটে চবি।' এই বলে গুরুজী নিজের পেট চাপড়াতে চাপড়াতে হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। বুড্ডা 'আল্লাহ্!' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠল। তারা উভয়ে কিছুক্ষণের জন্য নীরব রইলেন। গুরুজী বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললে বুড্ডা বুঝতে পারল যে এখন তাঁকে প্রশ্ন করা যায়। তাই সে বলল—'বর্তমানে স্থির থাকার চেষ্টা করেছি।'

'তোমার কথাই প্রমাণ করেছে যে তুমি বিফল হয়েছ, ' যোগ করলেন গুরুজী।

'আপনার কতা অসত্য হবে কিভাবে?'

'পৃথিবীটাকে ত্যাগ করতে পারছ না?'

'সবটুকুই ত্যাগ করেছি। তারপরও।'

'কী ত্যাগ করেছ তুমি?'

'বাড়ি, গাড়ি, ঘর, ব্যাংক-একাউন্ট, নতুন জুতো, বিদেশী টাই, চশমার দামি ফ্রেমটা, দামি ঘর।'

'ওগুলো কি অবৈধ ছিল?'

'না।'

'বৈধ প্রাপ্তি তোমাকে কে ত্যাগ করতে বলল?'

'তবুও করলাম। ওগুলোর ওপর আমার আকর্ষণ আছে কি না তা ওগুলোকে ত্যাগ করার আগে জানব কিভাবে?'

'সুন্দর। ডেয়ারিং পদক্ষেপ। কিন্তু তবুও কুপোকাত হয়ে আছ কেন?'

'চোর।'

'তোমার হাতে ছোট একটা ডায়েরি দেখেছিলাম।'

‘আগে নিজের জীবনী লিখতাম। তাও ফেলে দিয়েছি। এখন হাতে একটা টেলিফোন ইনডেক্স রাখি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের টেলিফোন নম্বর।’

‘তার মানে তুমি গোটা পৃথিবীটাকে সাথে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ?’

‘কখন কোন বিপদ হয়, কাকে ফোন করার দরকার হয়।’

‘ওটাকে ঐ দীঘির পানিতে ছুড়ে ফেলে দাও।’

‘আপনার কঠোরতায় আনন্দ পাই।’

‘এবার কেমন লাগছে?’

‘আহ! আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! অনেক হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল। একই সাথে নিজেকে উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল না রেখে আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দেয়া হলো ব'লে মন ভবিষ্যৎ-মুখী হওয়া থেকে অনেকখানি রেহাই পেল।’

‘ঠিক। উপায় উপকরণকে আল্লাহ্‌র নামে অবলম্বন করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যা চাচ্ছ তা অর্জন করতে হলে তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করতে হবে।’

‘সাধনার নির্জনতায় ডুবতে চাই।’

‘তাহলে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়। আল্লাহ্ পাক কালামে বলেছেন:

> ......যখন তোমরা পৃথক হয়েছ তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্‌র বদলে যাদের উপাসনা করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা ***গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর;*** তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিজ রহমত বিস্তার ক'রে দেবেন এবং তোমাদের কাজকর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

(১৮:১৬)

—নিজের নফ্‌স বা আশা-আকাঙ্খা থেকে পৃথক হয়ে ধ্যানের গুহায় লুকিয়ে পড়, তখন আল্লাহ তোমার ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিছিয়ে দেবেন। সুতরাং নিজের হৃদয়ের গভীর গুহায় লুকিয়ে পড়। আর সবাই যখন ঘুমায় তখন জেগে থাক, আর অন্য সবাই যখন জেগে থাকে তখন ঘুমিয়ে পড়।’

‘গুহাটা কিসের, গুরুজী?’

‘ঠিক এই মুহূর্তের। চিরবর্তমানের। যে কারণে দীর্ঘ ৩০৯ বছরও তাদেরকে অতীত ভবিষ্যৎ কোথাও ঠেলতে পারেনি, তাদের মৃত্যু হয়নি, তারা ঘুমিয়ে ছিল মাত্র (আয়াত ১৮:২৫)। তারা ভবিষ্যৎকে জয় করেছিলেন বর্তমানকে কাছে পাওয়ার কারণে। তারা ইতিহাসও জয় করেছিলেন:

> আর এরূপে আমি তাদের ব্যাপারটা প্রকাশ ক'রে দিলাম যেন তারা জানতে পারে যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা (জনগণ) নিজেদের মধ্যে তাদের (গুহায় অবস্থানকারীদের) ব্যাপারে বিতর্ক করছিল তখন তারা বলল: তাদের ওপর *স্মৃতিসৌধ* নির্মাণ কর।
>
> (১৮:২১)

সবচেয়ে বড় ইতিহাস এবং স্মৃতিসৌধ হলো পবিত্র কোরআনে তাদের উল্লেখ।’

চেষ্টা করছি একটা গর্ত খোঁড়ার। কিন্তু গর্তটাকে কেউ টেনে লম্বা করছে।’

‘বল, আমি ঠিক এই মুহূর্তকে নিয়ে আনন্দিত। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌!’

ধ্যানের গুহায় প্রবেশের আগে বাইরের পৃথিবীকে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু ‘আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য’ এই বিশ্বাস দৃঢ় না হলে তা সম্ভব নয়।

‘অতীতের পাপের কথা মনে পড়ছে।’

‘তাহলে বল আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ!’

‘পাপ নিয়েই খুশি হব?’

‘না। পাপের জন্য অনুতপ্ত হবার তৌফিক হয়েছে, এজন্য।’

‘আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌!’

‘এবার আমাকে বল—পাপটা অতীতের নাকি বর্তমানের?’

‘অতীতের।’

‘কিন্তু তা নিয়ে তুমি যে এখন **অনুতাপ** করছ, এই **অনুতাপ** অতীতের নাকি বর্তমানের?’

'বর্তমানের।'

'সুতরাং বর্তমানকে নিয়ে প'ড়ে থাক। অনুতাপের দিকে লক্ষ্য কর। তা তোমাকে বর্তমানে ধ'রে রাখবে। একই সাথে ভবিষ্যতের দিকে ঐ পাপের প্রবণতা যে পথে প্রলম্বিত হয়েছে, তা আর তোমাকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নেবে না। তা ছাড়া তুমি তওবা করার তৌফিক পেয়েছ ব'লে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলেছ—এজন্য তোমার তওবা যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তেমনি তুমি পাপ ক'রেও আনন্দিত হতে পারবে না। আল্লাহ্ কিছু লোকের পাপকে ভালো কাজের দ্বারা মুছে দেন। আবার এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের পাপের ওজনের সমান পুণ্য লাভ করে। যারা এভাবে তওবা করতে পারে, সেই পুরস্কার তাদের প্রাপ্য। কারণ তাদের পাপ থেকে যে জ্ঞানটুকু লাভ হয়েছে তা তাদেরকে তাওহীদের মারেফত শেখায়। মারেফত হলো খুশবু। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক তওবা করতে জানে না। শুধু তসবিহ গুনলেই তওবা হয় না। পাপ ছাড়তে পারার যোগ্যতা পেয়েছি—এই চিন্তা দ্বারা যে ব্যক্তি আনন্দিত হতে না পারল সে পাপের মজা ভোগ করবে কিভাবে? সে শুধু ভোগ করবে পাপের শাস্তি। আল্লাহ্ বলেছেন—মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে (১৭: ১১)। অর্থাৎ সে শুধু মন যা চায় তা পেলেই খুশি হবে ব'লে মনে করে, কিন্তু তার সাথে পরীক্ষামূলক যে অকল্যাণ জড়িত তার কথা সে ভাবে না। আয়াতটাকে বিপরীতাভাবে বিবেচনা করলে এও বুঝা যায় যে কোনো কল্যাণ চাইতে তার সাথে সংশ্লিষ্ট **পরীক্ষামূলক** অকল্যাণটুকু গ্রহণ করার ইচ্ছা ও আনুগত্যও থাকতে হবে। সে কথা আল্লাহ্ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ব'লে দিচ্ছেন:

> আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই, তখন তারা আনন্দিত হয়, এবং তাদের কর্মফলের দরুন তারা দুর্দশাগ্রস্ত হলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।
>
> (৩০: ৩৬)

এর মানে কী? এখানো তো আল্লাহ্ ব'লেই দিচ্ছেন যে, যদি নিজের ভালো চাও তো তোমার কৃতকর্মের বিনিময়ে আমি তোমাকে যে আঘাত ফেরত পাঠাই, তা গ্রহণ করার জন্যও প্রস্তুত থাক। শুধু মুখে তওবা করলেই কি তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে ব'লে মনে কর? তোমার কর্মফলকে তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন। অন্যথায় তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। নইলে তা হবে প্রতারণা ও বিদ্রোহ। কিন্তু আঘাতকে হাসিমুখে মেনে নেয়া সহজ নয়। সেজন্য সেক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করে অপেক্ষা করাই যথেষ্ট। অন্তত **তাকে মাথা**

**পেতে নেয়ার মতো বিবেকটুকু পেয়েছি—এই কথা ভেবে আনন্দিত হতে হবে**। এবার তওবা কর। বল—**আমার সমস্ত পাপের জন্য আমি লজ্জিত। আমি তার সমস্ত প্রতিফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যেহেতু তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম, সেহেতু আমার এই নতিস্বীকারই যেন আত্মসমর্পণ এবং ক্ষমাপ্রার্থনা বলে কবুল হয়। —যারা আল্লাহ্‌র কাছে শুধুই ক্ষমা চায় কিন্তু কর্মফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তারা পলায়নপর স্বভাবের হয়ে যায়, এবং আল্লাহ্ যখন তাদেরকে শাস্তি দ্বারা তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করেন, তখন তারা আল্লাহর কাছ থেকে দৌড়ে পালায়। এরূপ অবস্থায় ইমান যায়-যায় পর্যায়ে নড়াচড়া করে। সাবধান! আল্লাহ্ বলেছেন যে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করার পর অবিশ্বাসের জন্য মন খোলা রাখলে তার জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। তিনি এও বলেছেন যে শুধু মুখে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি বললেই চলবে না—কাজে প্রমাণ দিতে হবে।**'

'গুরুজী, আমি ঠিক আপনার দেখানো পদ্ধতি অনুসারে তওবা করার জন্য প্রস্তুত। কারণ এটাই আল্লাহ্‌র দেখানো পদ্ধতি।'

'এবার বল—আল্‌হামদুলিল্লাহ।'

'কেন গুরুজী?'

'কারণ, আমি এত পাপ ক'রেও এখনও টিকে আছি।'

'পাপ ক'রে তো অনেক ছোটখাট ফেরাউনও টিকে আছে।'

'কিন্তু আমাকে আল্লাহ্ এখনও ধ্বংস করেননি। তাঁর করুণা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তওবা করার তৌফিক দিয়েছেন। ফেরাউনের তো সময়মতো তওবা করার তৌফিক হয়নি।'

বুড্ডা বলল—'আলহামদুলিল্লাহ॥'

গুরুজী বললেন—'বল আলহামদুলিল্লাহ।'

'কেন গুরুজী?'

'কারণ আমার কোনো অতীত নেই।'

'কিন্তু আমি অনেককে কথা দিয়েছিলাম তাদেরকে উপকার করব। সেই প্রতিজ্ঞা এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

‘Good!’ **প্রতিজ্ঞাটা** কোন সময়ের?

‘অতীতের।’

‘এটাই প্রমাণ ক’রে যে **কেউ তার দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পন্ন না ক’রে চিরবর্তমানে পৌঁছাতে পারে না। দায়িত্ব পালনে যে গাফেল তার নামাজ এবং ধ্যানের মধ্যে সেই-সব দায়িত্ববোধের কথা বেশি মনে পড়বে**। সুতরাং ঘরে তরতাজা বউ এবং শিশু-সন্তান রেখে বারমাস তাবলিগ করে বেড়ানো অপরাধ। আল্লাহ্ মানুষকে বড় দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন—এমন দায়িত্ব যা আকাশও পর্যন্ত গ্রহণ করতে চায়নি।’

‘তাহলে কি আপনি আমাকে এখন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরত পাঠাবেন? আমার কি তা না করা পর্যন্ত মুক্তি হবে না?’

‘প্রতিজ্ঞা পালন করার যোগ্যতা এখনও তোমার হয়নি। কিন্তু যে ***দায়িত্ববোধটা*** তোমার মধ্যে জেগেছে তা কোন সময়ের?’

‘বর্তমানের।’

‘তাহলে সেই **বোধটাকে** নিয়ে আনন্দিত হও এবং বল আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তুমি দায়িত্ব পালন না ক’রেও বর্তমানে তার বোঝা নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। পরে আল্লাহ্ যখন চাইবেন তোমাকে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ক’রে ফেরত পাঠাবেন।’

তিনি বললেন—‘বল আল্হাম্দুলিল্লাহ! আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সব ভবিষ্যৎ আল্লাহ্র হাতে। **আমি কিছু চাই না। আমি যা পেয়েছি তা নিয়ে তৃপ্ত। বল, আমার অতীত বর্তমান হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎও বর্তমান হয়ে গেছে। বল—আমি অতীতে যেখানে ছিলাম, বর্তমানে সেখানে আছি, ভবিষ্যতেও থাকব।**’

বুড্ডা বলল, ‘কিন্তু যেই বলছি *ছিলাম*, *আছি*, *থাকব*—অমনি চিন্তা চ’লে যাচ্ছে সময়ের তিনভাগে।’

‘ঠিক বলেছ। সুতরাং নতুন ক’রে ব্যকরণ শিখতে হবে। বল—**আমি অতীতে যেখানে আছি, বর্তমানেও সেখানে আছি, ভবিষ্যতেও সেখানে আছি।**’

'সুন্দর! আহ, সুন্দর! কিন্তু গুরুজী, আমি যেই ***বর্তমানেও ভবিষ্যতেও অতীতেও*** শব্দগুলোতে 'ও' লাগাচ্ছি, অমনি মনে হচ্ছে যে তারা একটার থেকে অন্যটা আলাদা। তখন তো সমস্যা হচ্ছে। ধারাবাহিকতা থাকছে না।'

'Very good! তাহলে গ্র্যামার শেখা শেষে এবার নতুন ক'রে লজিক শেখ। বল—**আমি গতকাল যেখানে আছি আজ সেখানে আছি আগামীকাল সেখানে আছি।** —কথাগুলোকে কোনো কমা ছাড়াই বল।'

'কিন্তু গুরুজী, *যেখানে সেখানে* এই শব্দদুটো তিনটা ভাগকে এখন দুইটা ভাগে ভাগ ক'রে দিচ্ছে।'

'একসেলেন্ট! তাহলে এবার বল—**আমি অতীতে এখানে আছি বর্তমানে এখানে আছি ভবিষ্যতে এখানে আছি।'**

'আহ, মধুর! কিন্তু গুরুজী, *অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ* শব্দগুলো চিন্তাকে আবারও ভাগ ক'রে দিচ্ছে।'

'রাইট! তাহলে বল—**আমি আজ এখানে ছিলাম আজ এখানে আছি আজ এখানে থাকব।'**

বুড্ডা জ্ঞান হারাল।

গুরুজী বললেন—'আনন্দে জ্ঞান হারানো উচিৎ নয়। নিজেকে সংযত করা হলো বড় সাধনা। ইংরেজিতে যাকে বলে ইকোয়্যানিমিটি বা সাম্যমনস্কতা, এবং বৌদ্ধধর্মে বলে *উপেক্ষা*, তা অর্জন করতে হবে। সুখে ফেটে পড়াও যাবে না, দুঃখেও ভেঙে পড়া যাবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এই আদেশ দিচ্ছেন। এর চেয়ে বড় মাইন্ড কন্টোল আর নেই। গোটা মহাবিশ্বের কোথাও নেই! তথাকথিত *মাইন্ড কন্ট্রোল* এর কাছে তুচ্ছ। শোনো তাহলে আয়াতটা:

> পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার আগেই তা লিপিবদ্ধ করি; আল্লাহ্র পক্ষে এ অতি সহজ। এ জন্য যে, তোমাদের ওপর যা অতীত হয়েছে (অর্থাৎ তোমারা যা হারিয়েছ) তার জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন (অর্থাৎ যা তোমরা পেয়েছ) তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হয়েঅ না, আল্লাহ্ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না।
>
> (সূরা হাদীদ: ২২-২৩)

‘গুরুজী, মনে হয় আরেকটু এগোনো যেত।’ ]

‘কিন্তু পরের ধাপে তোমাকে এখন নেয়া যাবে না। যে দুইটা অনুশীলন দিলাম তা বারবার করতে থাক। **তওবা থেকে শুরু করবে। থামবে এসে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌-তে। অবশেষে শুধু বর্তমানকে নিয়ে প’ড়ে থাকবে। যাস্ট চুপ!’**

‘কিন্তু গুরুজী, সমস্যা একটা হচ্ছে।’

‘জানতাম।’

‘কিন্তু বলতে পারলে আমারই ভালো হবে। বুকটা খালি হবার সুযোগ থাকবে।’

‘অর্ধেক ব’লে থেমে যেয়ো।’

‘জ্বী। পুরোটা বলা মানে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করা।’

‘তুমি এখনও বোকা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করনি।’

‘জ্বী। আপনার আদর পেলে বেশি কথা ব’লে ফেলি।’

‘বল।’

‘যেই নিজেকে বলছি—আমার কোনো আফসোস নেই—আমি যা পেয়েছি আর যা পাইনি, সব নিয়ে আনন্দিত—অমনি মনের ভেতর থেকেও একটা মন উঁকি মেরে থাকছে—বলছে, ‘মেনে নিলাম, অপেক্ষাও করলাম। কিন্তু পাচ্ছি না তো।’

‘পুরোপুরি বলনি তো?’

‘অর্ধেক।’

‘গূড।’

‘সমাধান?’

‘সমস্যাটাই তো মধুর। সমাধানের দরকার কী?’

‘কেমন?’

‘এই অপেক্ষার প্রবলতা এক সময়ে এত বেড়ে যাবে যে তুমি হঠাৎ একদিন দেখবে যে আর অপেক্ষা ব’লে কিছু নেই।’

‘কারণ?’

‘দেখবে যে সেই অপেক্ষার আগুনে পুড়ে পুড়ে সমস্ত আশা আকাঙ্খা ছাই হয়ে গেছে। গোটা মহাবিশ্ব এ্যাচই হয়ে গেছে। তখন আছে শুধু লেলিহান অপেক্ষার আগুন। খেতে বসতে উঠতে চলতে ঘুমুতে তা তোমাকে এখমুখী ক’রে রাখবে। যেহেতু তুমি অতীত বর্তমানকে থামিয়ে দিয়েছ, সেহেতু তোমার মনের এবং নফসের সমস্ত শক্তিটুকু পুড়ে প্রবল প্রেমের তাপ সৃষ্টি করবে। এবং একসময়ে দেখবে যে অপেক্ষা ব’লে আর কিছু নেই।’

‘যেমন?’

‘তখন থাকবে শুধু অপেক্ষা।’

‘এবং?’

‘এবং দেখবে যে অপেক্ষা ব’লে আর কিছু নেই।’

‘কারণ?’

‘কারণ তখন তুমি দেখতে পাবে যে *তুমিই একরাশ অপেক্ষা।* তোমার সত্তাটাই একটা অপেক্ষা। ফলে অপেক্ষার কষ্ট তোমার আর নেই। তুমি তোমাকে পেয়ে গেছ। এবং *যাঁর* জন্য এই অপেক্ষা অর্থাৎ *যাঁর* জন্য এই *তুমি*, তিনি আর বেশি দূরে নন।’

‘তাহলে তো অপেক্ষা বেড়েই যাবে।’

‘তুমি নিজে যত বাড়বে তত তো তোমরই লাভ।’

‘আহ্! তারপর?’

‘চুপ! সবকিছুর আবার পর হয় নাকি?’

‘আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ, গুরুজী।’

‘আই লাভ ইউ ঠু।’

বুড্ডা আলো-বাতাস-মাটির সংস্পর্শ হারাল। ফলে সে আর কথা বলতে পারল না।

মিনিট দশেক পর সে জেগে উঠে বলল—‘গুরুজী, ঠিক এই মুহূর্তে আমি—মানে আমি.....আহ্! এত ঘ্রাণ! আহ্! এত বিশালতা। আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গুরুজী, আমি কি একটু চিৎকার ক’রে উঠব? মানে....আসলে আমি....।’

‘চুপ! একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাও। পাশেই ইবলিস ব’সে আছে। তোমার এখনও বাকি। ও তোমার কথার মধ্যে ঢুকে পড়বে।’

বুড্ডা চুপচাপ ব’সে রইল।

চৌদ্দ

## অসমাপ্ত মৃত্যু

গুরুজী বললেন—‘জেগে ওঠ। কারণ তোমার সমস্যা আছে।’

বুড্ডা বলল—‘জানতাম।’

গুরুজী বললেন—‘এক স্বপ্ন বারবার দেখ কেন? একি সাংঘাতিক ঘটনা!’

‘গুরুজী, আমি অবাক হবার আগেই বিষয়টা ধ’রে ফেললেন?’

‘আটকে যাচ্ছ কেন?’

‘চোরাবালি।’

‘এটাই আল্লাহ্‌র রহমত।’

‘কার মাধ্যমে?’

‘ইবলিসের মাধ্যমে, নফসের মাধ্যমে।’

‘কেন?’

‘যেন তুমি বারবার চেষ্টা করতে করতে এমনভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠ যে আর এক ভুল জীবনে দুইবার না ঘটে।’

‘তারপর, গুরুজী?’

‘তারপর কোনো ভুলই না ঘটে।’

‘স্বপ্ন ছাড়া কি ঘুম সম্ভব না?’

‘তুমি স্বপ্নের মধ্যেও পাপে সম্মতি দাও কিনা তার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বপ্ন আসবেই।’

‘বড় সমস্যা। স্বপ্নের মধ্যে কেউ থাকে না। ফলে পাপ করার ইচ্ছাগুলো ছাড়া পেয়ে যায়।’

‘স্বপ্নের রাজ্যে কী আল্লাহ্ নেই?’

‘গুরুজী, আপনার কথাগুলো ছুরির মতো।’

‘এটাই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ।’

‘সত্য যে বড়ই কঠিন।’

‘একটা কথা বলি: অনেক মুসলমানই কেবল জাগরণের সময়ে মুসলমান, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে মুসলমান নয়। সুতরাং ঘুমের মধ্যেও মুসলমানিত্ব ছেড় না। বল—কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।’

‘আমি বললেও মন বলে না।’

‘কেন এত চিন্তা ক’রে কথা বল? দেখ, আয় রোজগারের জন্য কাজ করা ফরজ। ক্ষমতা থাকলে তা না করাই অপরাধ। কিন্তু তুমি শ্রমের বিনিময়ে কতটা পাবে তা নিয়ে ভাবা নিষেধ। তার মানে এই নয় যে তোমাকে কেউ ফাঁকি দিলে তা মেনে নিতে হবে। আমার আদেশ তোমার মনের ব্যাপারে। মনের কন্‌সেনট্রেশন পাবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। টাকার তথা সম্পদের হক পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি কাজ ক’রে যাও। তোমার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তুমি পাবেই পাবে। এমনকি তুমি যদি কাজ না-ও কর, কারণ তুমি সংসারত্যাগী, তবুও তুমি তোমার প্রাপ্য অংশটুকু পেয়ে যাবে। আবার যা তোমার কপালে লেখা নেই, তা তুমি কখনও পাবে না। অবশ্য ভাগ্য-বহির্ভূত প্রাপ্তি পাবার আলাদা আমল আছে, যা এখন আলোচ্য নয়—তা পেতে চাইলে *ধ্যানের শক্তি এবং নবজীবন* বইটা থেকে পদ্ধতিটা জেনে নিতে পার। মোট কথা, প্রাপ্তির দিকে কোনো খেয়াল বা আসক্তি রাখার দরকার নেই। তুমি যদি কোটি টাকাও পাও, তো দোষ নেই। টাকার হক আদায় করবে। আসক্তি ত্যাগ করবে। তা যদি করতে পার, তাহলে টাকা কোন ক্ষেত্রে কিভাবে খরচ করলে ঘাড়ের বোঝা কমবে এবং সাথে টাকার সদ্ব্যবহার হবে তা আল্লাহ্‌ই তোমাকে ব’লে দেবেন। তা তিনি করবেন তোমাকে স্বাভাবিকভাবে সঠিক দিকে পরিচালিত করার মাধ্যমে বা আবশ্যকতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে বা স্বপ্নযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে। তখন তুমি যা করবে তার জন্য তোমার কোনো অপরাধবোধ জাগবে না। এর চেয়ে উচ্চ এমনও পর্যায় আছে যেখানে যেতে পারলে তুমি কোনো কর্মের ফল ভোগ করবে না। কারণ তখন আল্লাহ্‌ই তোমার সকল কাজ পরিচালনা করবেন। এখন দেখ, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার কী দরকার?’

‘তাহলে কি কাজ করব না?’

‘কাজ তো ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানের।’

‘জ্বী, বুঝেছি। ....কিন্তু কোনো কাজ নিয়ে কি পরিকল্পনা করব না?’

‘অবশ্যই করবে। তাও ঘটবে বর্তমানে। **ভবিষ্যৎ কেবল থাকবে তোমার হিসাবে বা যুক্তিতে, অনুভূতিতে বা আশা-আকাঙ্খায় নয়।** আবার সেই প্ল্যান নিয়ে যখন কাজ করবে, তখন তো তুমি বর্তমানেই কাজ করছ।’

‘আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ!’

‘তোমার চোখের চশমাটা প’ড়ে ভেঙ্গে যাক।’

‘এক গুরুর কাছে গিয়েছিলাম যিনি আমাকে চশমা খুলে ফেলতে বলেছিলেন অথচ আমার চোখে কোনো চশমা ছিল না।’

‘নিজের চশমা সম্পর্কে সচেতন থাকা খুব কষ্টকর, বিশেষ ক’রে তার *পাওয়ার* যদি পুরোপুরি চোখের সাথে সেট হয়ে যায়। এজন্য আমি তোমাকে তা খুলতে বলছি না। আমি চাচ্ছি যে তুমি মাথাটা নত কর আর চশমাটা প’ড়ে ভেঙে যাক।’

‘আধুনিক যুগের জ্ঞানী-গুণীদের অনেকে আবার কথা বলার ভাব-ভঙ্গির মধ্যে চশমা বারবার খোলেন আর লাগান। তাতে তাদের চিন্তাবিদসুলভ ভঙ্গিটা ধারালো হয়।’

‘চশমার মনস্তত্ত্বটা এত মধুর যে তা একেবারে নারী মনস্তত্ত্বের মতো।’

‘তৃষ্ণা হচ্ছে।’

‘অন্য কোনোদিন।’

‘সমস্যা হচ্ছে।’

‘ঠিক বর্তমানে নিজেকে ধ’রে রাখ।’

‘কিন্তু তারপরও..... ।’

‘অনেক কিছুর পরও অনেক কিছু থাকে।’

‘মনের কোথায় যেন চাপ পড়ে।’

‘তারপর?’

‘স্থির থাকতে চাইলে বেঁকে আসে।’

‘কে?’

‘মন এবং দেহ উভয়ই।’

‘গূঢ় ডিসকভারি! দেখলে তো যে তোমার **মনের সাথে দেহও সংযুক্ত? তা টের পাওয়া যায় কেবল মনকে কন্ট্রোল করার সময়ে?’**

‘এবং নামাজের সময়ে।’

‘হ্যাঁ, নামাজ হলো মহাবর্তমানের সাথে মিলন। তখন মনটা একবিন্দুতে আসতে চায় না। ধর তোমাকে জোর ক’রে মনকে একবিন্দুতে আনতে বলা হলো। তখন কী ঘটবে?’

‘ও মাই গড! চোখ ছিড়ে বের হয়ে আসবে। ফুসফুস আটকে যাবে। গলা বুক শক্ত হয়ে যাবে। তবুও......।’

‘তবুও কাজ হবে না। কিন্তু ধর বাইরের কোনো আকর্ষণ বল যেমন চুম্বক দ্বারা তোমার দুচোখের মাঝামাঝি অর্থাৎ সিজদার জায়গা থেকে যদি তোমার মনটাকে টেনে জোর ক’রে এক বিন্দুতে এনে বের ক’রে নেয় হয়, তখন কী ঘটবে?’

‘ও মাই গড! তাহলে তো গোটা শরীর চিরে চিরে থেতলে মনটা বের হয়ে আসবে। সে যে গলা কাটার চেয়ে কষ্ট বেশি। সারা গায়ে কাঁটা ফুটবে।’

‘ঠিক। গলা কাটার তেমন কোনো কষ্ট নেই। এজন্য রসূল (সঃ) যে শহীদের মৃত্যুকষ্ট একটা পিঁপড়ের কামড়ের মতো। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মৃত্যু বড়ই কঠিন। মনে রাখবে, মৃত্যু হলো মনটাকে এক বিন্দুতে আনার চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং সুযোগ। এভাবে মন আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। এ হলো প্রেম। কিন্তু যে ব্যক্তি আগে থেকে প্রস্তুত নয়, তার অবস্থাটা কেমন হতে পারে ভেবে দেখ। মৃত্যু হলো ধ্যানের চূড়ান্ত রূপ। তখন মনটাকে এক বিন্দু থেকে বাইরে থেকে আকর্ষণ করা হবে, অর্থাৎ জোরপূর্বক তাকে তার উৎসবিন্দুর সাথে মিলানো হবে। সুতরাং সাবধান।’

‘আহ্!’

‘অথচ **এই কষ্টের সম্পূর্ণটুকুকে ভোগ না ক’রে তুমি মুক্ত হতে পারবে না। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা এবং অপেক্ষা এবং হতাশা এবং আশা এবং রোগ-ব্যাধির কষ্টের মধ্য দিয়ে তোমাকে পোড়ানো হবে। তার আগে সেই স্তরের মুক্তি জুটবে না, যা তুমি আশা করছ।** নামাজ যখন গভীর হয়, তখন পায়ে

একটা পিঁপড়া কামড়ালেও মনে হয় গোটা শরীরে বজ্রপাত হয়ে গেল, এবং সমস্ত আঘাতের ছুরিটুকু হার্ট আর মাথা ভেদ ক'রে চ'লে গেল।

'জ্বী, জ্বী।'

'তাহলে মৃত্যুর সময়ে কী ঘটবে?'

'ভয় হচ্ছে।'

**'প্রচুর পরিমাণে ভয় না পেলে সেই ব্যাথা ও ভয় কোনোটাই যাবে না।** সুতারং চিরবর্তমানে স্থির হওয়া অত সোজা নয়।'

'কিন্তু গুরুজী, এত কিছুর পরও অন্তত গভীরে প্রবেশ করার সময়ে গভীরে কেউ সন্দেহ তোলে।'

'আর সেই সন্দেহকে বিশ্লেষণ করতে করতেই কনসেনট্রেশন ভেঙে যায়, তাই তো?'

'জ্বী।'

'এটাই প্রমাণ করে যে **তোমাকে এমন জ্ঞানী হতে হবে যেন জ্ঞানের আলোয় সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তোমাকে সন্দেহের রহস্য সম্বন্ধে জানতে হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রহস্যের মধ্যে একটা হলো সন্দেহের রহস্য। একে যিনি জানেন তিনি জগৎকে অতিক্রম ক'রে যান।** কিন্তু এর রহস্য একজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে কিনা আমার তা জানা নেই। তোমাকে তার কাছে পাঠাব। যারা সন্দেহকে অতিক্রম করেছেন অথচ সন্দেহের ব্যাখ্যা জানেননি, তাদের কাছে এর রহস্য জানা সম্ভব নয়। তারা অন্যকে সন্দেহমুক্ত করার যোগ্যতাও রাখেন বটে, তবে সন্দেহকে একটা জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ একেক জনকে একেক দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।'

'যদি জানতে পারতাম।'

'সে সময় তোমার এখনও হয়নি। তোমার মতো গাধাকে দিয়ে এখনও পর্যন্ত বড় বোঝা বহন করানো সম্ভব নয়।'

'গুরুজী, সবাই গাধাকে দিয়ে মালপত্র এমনকি বইপুস্তক বহন করার কাজও করায়। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে ইহুদী (ও নাস্তিক) জ্ঞানীদেরকে

এরূপ গাধার সাথে তুলনাও করেছেন। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনি তো জ্ঞানের দুরূহ বোঝাও বহন করাতে চাচ্ছেন।'

গুরুজী হেসে বললেন—'গাধার অত কিছু বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ নয়। বুদ্ধিমান গাধা বোঝা বইতে চায় না। গাধা যখন বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যায় তখন সে নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে। আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর রহস্য ও দায়িত্ব ও প্রেম বহন করার জন্য অনুগত গাধা বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তর্ক করে ও বেঁকে বসে। আল্লাহ্‌র গাধা হওয়ার মর্যাদা কোথায় তা মানুষ জানল না।'

'গুরুজী, গাধাকে দিয়ে গাধার মালিক সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটাকে বহন করায়?'

'নিজেকে।'

বুড্ডা চুপ হয়ে গেল। খানিক ভেবে বলল—'আমি আপনাকে বহন করতে পারব তো?'

'পুরো মালিকানাটা এখনও হাতে বুঝে পাইনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তাঁর গাধা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন। তাকে দিয়ে তিনি যা ইচ্ছা বহন করান।'

'গুরুজী। অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল। প্রায় সবকিছু।'

'সবকিছু শেষ হয়ে গেলে সবকিছু পেয়ে যাবে।'

'কবে?'

'তুমি আবার ভবিষ্যতের দিকে ছুটছ। ওটাও মনের কৌশল। কী পেলে বা না পেলে তাতে তোমার হাত নেই। তুমি শুধু চিরকালের তওবা এই মুহূর্তে ক'রে ফেল। চিরকালের ত্যাগ এই মুহূর্তে সেরে ফেল। **তওবার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় অনেকেই ভুলে যায়—এক. অনন্ত কালের জন্য তওবা এবং শুধু জাগরণ নয় স্বপ্নের জন্যও তওবা, এবং দুই. প্রতিদিন নতুন ক'রে তওবা।** প্রথমে নতুন ক'রে তওবা করতে হচ্ছে ব'লে—অর্থাৎ মনটা দুর্বল ব'লে—আমি লজ্জিত। এর জন্য একটা তওবা। পরে আসল তওবা।'

'অনেক সময়ে মন বলে—হয়তো হবে। পেয়েও যাব।'

‘এটাও মনের আরেকটা কৌশল। ‘হবে’ মানেও ভবিষ্যৎ—আশার মধ্যেও দূরত্ব। তবে তোমার বর্তমান স্তরে এই আশাটাই আসল। আশার আগুনে পুড়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ধাপ তোমার জন্য বৈধ নয়।’

‘মনে কুৎসিত কথাবার্তা এখনও মাঝে-মধ্যে আসে। মনে হয় আত্মহত্যা করি।’

‘এরও রহস্য জানা আছে খুব কম লোকের। এর রহস্য জানার সাথে গোটা সৃষ্টিরহস্য জানার সম্পর্ক আছে। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।’

‘তা তো জানতাম না। বলবেন না ব’লে মনে হচ্ছে।’

‘পরে।’

‘গুরুজী, সবকিছু অতীত হয়ে যায় কেন?’

‘আমাকে দেখাও কোন জিনিসটা অতীত হয়।’

‘সুখের স্মৃতি। অর্থনৈতিক অবস্থা। ভালোবাসার দিনগুলো। এই সুন্দর দেহটা।’

**‘তুমি সুখের কথা বলছ? কখন সুখ পেয়েছ তুমি? তুমি যদি একদিনও সুখ পেতে, তাহলে তো তোমার সমস্ত কষ্টের এবং আফসোসের অবসান ঘটত। ফলে তুমি আর কোনো আকাঙ্খা করতে না। তুমি তো সুখই পাওনি। কারণ তুমি কোনো একটা বর্তমানের মধ্যে স্থিরভাবে ব’সে একবারও আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে পারনি। তুমি তো সুখের কল্পনা করেছ মাত্র। ফলে তোমার কাছে একদিন যা ছিল ভবিষ্যৎ বা কল্পনা তাই অতীত হয়েছে, অন্য কিছু নয়।** কেউ কি বলছে—আমি এখন সুখী? তাহলে তো সে আর কিছু কামনাই করত না। আমি তো কিছু কামনা করি না। আল্লাহ্‌র কাছেও আমার কিছু চাওয়ার নেই নিজের জন্য, তাঁকে ছাড়া। কেউই সুখ পায়নি। শুধু বলেছে—এই তো পাব পাব ভাব। কেউ একটু আধটু পেলেও তার ভবিষ্যতের দিকে গতি গেছে বেড়ে। ফলত তার কামনা তার বর্তমানের পাওয়াকে মাড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে। তখন সে যা চেয়েছে তা যখন সে পেয়েছে, তখন কিন্তু তার মন আরো সামনে এগিয়ে গেছে, সেখানে নেই। **কেবল ভবিষ্যৎই অতীত হয়। সব ধরনের সুখের ক্ষেত্রে একই কথা।** তুমি কী নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিলে? বস্তু? *তোমার সুখটুকু নিয়ে তুমি কখনও সুখী হতে চাওনি। সুখ নিয়ে সুখী হতে পারার মধ্যেই সুখের সমস্ত রহস্য নিহিত। এটাই প্রকৃত তৃপ্তি, আত্মসমর্পণ এবং*

*কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা।* অথচ তুমি তা চাওনি। তুমি চেয়েছিলে শুধু পানি। তৃষ্ণার সুধাটুকু পান করনি। বস্তু তো নশ্বর। তাই তা তার মেয়াদ শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। *মানুষ চিরকাল ভোগটার দিকে তাকাল, উপভোগের দিকে তাকাল না।* একটা নারীকে ছেনে-ছুঁয়ে একটা পুরুষ কী পায়? কী পায়? কী? নিজেকে পায়। নিজেকে! সব আনন্দ তো ভেতরে। বাইরের বস্তু তাতে পৌঁছানোর অবলম্বন মাত্র। আল্লাহ্ মানুষ ও জিনকে বস্তুর ওপর নির্ভরশীল ক'রে দিয়েছেন এটা পরীক্ষা করার জন্য যে তারা যা থেকে আনন্দ পায় তার সাথে কী আচরণ করে। মানুষ ধর্ষণও করে, খুনও করে। স্ত্রীকে ভোগও করে, নির্যাতনও করে, বঞ্চিতও করে। আবার সুখ না পেলে দোষ তার। নারীর ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ প্রযোজ্য। কেউ যদি জানত যে প্রকৃত উপভোগ নিজের ভেতরে, তাহলে সে আর নিজের সাথে জুলুম করত না। বস্তুকে অবলম্বন করলেও তার ওপর নির্ভরশীল থাকত না, আবার সুখ ভেতরে—এই সত্য জানলে কেউ জুলুম করতে পারত না, কারণ **মনোভাবের যে-কোনো ত্রুটি-ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত হোক—মনকে তার শান্তি ও তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখে।** এজন্য আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের **জানা অজানা** সব ভুলই ক্ষমা করেন। সুখের ফর্মুলা জগতের কেউ জানে না, কেউ না—সাধকগণ ছাড়া, তাও কেবল সেই সাধকগণই তা জানেন যারা আল্লাহ্র প্রেমিক, তারা নয় যারা অলৌকিক ক্ষমতা হাসিলের জন্য সাধনা করে। মুক্তিই সুখ। তবুও সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখ যে **বর্তমান কখনও অতীত হয় না, ভবিষ্যৎও অতীত হয় না। অতীত হয় কেবল কল্পনা। যা মায়া তার অতীত হয়ে যাওয়াই স্বাস্থের লক্ষণ। আল্লাহ্ তাঁর ফর্মুলায় কখনও ভুল করেন না। তুমি আল্লাহকে এজন্য ধন্যবাদ দেবে কি, তাকে দোষারোপ করছ?** কান্নাকাটি করছ? তোমার মতো গর্দভের সুখ পাওয়ার যোগ্যতাই নেই। জেনে রেখ, **বর্তমানই সুখ। তাতেই মহাসুখ। স্থায়ী সুখ। চিরস্থায়ী সুখ। তাতে যে তুমি পৌঁছাতে পারছ না—এটাই তার প্রথম প্রমাণ। তাতে যারা পাকাপোক্তভাবে পৌঁছে যান তারা আর কখনও দুঃখের জগতে ফিরে আসেন না এবং দুঃখের বা ক্ষণস্থায়ী সুখের দ্বারা প্রভাবিত হন না, এটাই হলো তার দ্বিতীয় প্রমাণ।** অবশ্য এই সুখের এমনও একটা পর্যায় আছে যা সহ্য করতে না পেরে অনেকে দেহত্যাগ করেন। এই পর্যায়ে গিয়ে বেঁচে থাকেন কেবল তারা যাদের ওপর অনেক কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে। এই সুখ অবশ্য ১০০% বিশুদ্ধ প্রেম। তা আমাদের মতো সাধারণ লোকের ভাগ্যে হয়তো নেই। অসাধারণ সুখ বাদ দিয়েও সুখী হওয়া যায়, আল্লাহকে পাওয়া যায়।'

'সবকিছু ভবিষ্যতের দিকে চ'লে যাচ্ছে।'

'অতীত হবার জন্য। সুতরাং আবার টেনে আন। আবার যাক। এভাবে লক্ষ লক্ষ বার সংগ্রাম করতে থাক। আকর্ষণের সুতোগুলো দুর্বল হয়ে যাক।'

'তারপর?'

'একদিন মনটা উধাও হয়ে যাবে। থাকবে না কোনো আকর্ষণ। সব আকর্ষণ মনের।'

'তখন কী থাকবে গুরুজী?'

'চিরবর্তমান। আহ, কি মধুর। মহাপ্রেম।'

বুড্ডা গুরুজীর তৃপ্তিভরা মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে তাঁর কথাগুলো শুনছিল আর ছেলেমানুষের মতো ডান হাতের পাতাটাকে তালপাতার পাখার মতো মেলে ধ'রে অনর্থকভাবে এপাশ-ওপাশ করছিল। সে মিনিটখানেক ধ'রে এভাবে ছেলেমি করার পর হঠাৎ ক'রে গুরুজীকে প্রশ্ন করল: গুরুজী, 'যার মন নেই তার নাম কী?'

গুরুজী সন্দেহপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ ধারালো ক'রে বুড্ডার দিকে তাকালেন। বুড্ডা ঠোঁটে ঔৎসুক্যের হাসি নিয়ে গুরুজীর দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে পড়ল। খানিক পর গুরুজী আকস্মিকভাবে একটু শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করলেন। বুড্ডা বোকার মতো হাসতে হাসতে তাঁর পিছু নিল। তাঁরা যেখানে ব'সে ছিলেন সেখানে তীব্র, তীক্ষ্ণ, মিষ্টি একটা ঘ্রাণ ছিল। মৃদমন্দ বাতাস এসে তা বয়ে নিয়ে গেল পৃথিবীর সেসব জায়গায় যেখানে তৃষ্ণাতুর নাকগুলো অপেক্ষায় রয়েছে।

**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**

## একটি চিঠি এবং

## তর জবাব

প্রিয় পাঠক! কিছুকাল আগে একটি চিঠি পেয়েছি যার মধ্যে ইমানের ভ্রান্তির কিছু চমৎকার নিদর্শন রয়ে গেছে। জ্ঞান আর ইমান যে এক নয়, তা বাক্যবিলাসী জ্ঞানীদেরকে বুঝানো যায় না। সুতরাং বিজ্ঞ পাঠককে এই বাস্তবত উদাহরণটি দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। লেখকের অনুরোধ, জবাবের চেয়ে চিঠিটিকে বেশি গুরুত্বের সাথে পড়বেন।

নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা

১৭. ০৫. '০২

প্রিয় মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম। বেশ কিছু দিন ধরে আপনাকে লিখব বলে ভাবছি। তবে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম পাচ্ছিলাম না। শেষে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রেরিত পত্র পৌঁছে দেবেন। ধন্যবাদ জ্ঞানকোষ কর্তৃপক্ষকে।

জনাব, আপনি কি পাঠকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী আছেন? লেখক, পাঠকের সম্পর্ক তো 'বই' কে ঘিরে গড়ে ওঠে। সেই বই নিয়ে পাঠকের যদি কোনো অভিযোগ থাকে - তবে লেখকের নিশ্চয়ই একটা দায়িত্ব এসে যায়। আমি বিশ্বাস করি, এস. এম. জাকির হুসাইন একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। ইংরেজী ভাষায় ভদ্রলোকের এক বিশাল দখলদারিত্ব রয়েছে। সাধারণ পাঠকের জন্য ইংরেজীর টেকনিক্যাল দিক নিয়ে যুৎসই আলোচনা করেছেন। আর একারণেই জাকির হুসাইন আমার 'প্রিয় লেখক' তালিকার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। কিন্তু 'কোরানিক সেল্ফ কন্ট্রোল এবং মৃত্যুহীন জীবন' বইটি পড়তে গিয়ে দারুন মর্মাহত হলাম। বইটি যে উদ্দেশ্যে বাজারে ছেড়েছেন তা পূর্ণ হয়েছে কি? আমাদের পাঠকরা কতটা শ্রম দিয়ে একটা বই আত্মস্থ করেন, তা আপনি জানেন কি? সর্বোপরি বইটি সম্পর্কে বলতে হয়: কোরআনের আয়াতগুলো যাচাই না করেই সেট করেছেন। যেমন ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আদি পিতা আদম (আঃ) এবং আদি মাতা হাওয়া (আঃ) ইবলিসের প্ররোচনায় সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন।" কোরআনের কোথাও বলা নেই আদম প্রথম মানুষ অথবা আদি পিতা। আর হাওয়া নামটি তো কোরআনে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এরপর প্রশ্ন হলো: তথাকথিত বেহেস্তে সেই নিষিদ্ধ গাছটি থাকার প্রয়োজন ছিল কি? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

> "তোমাদের জন্য এটিই রইল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না। এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।"

(২০: ১৮-১৯)

আপনাদের কথিত সত্য কাহিনী সত্য হিসেবে ধরে নিলে, আমার প্রশ্ন হলো: ক্ষুধার্ত না হয়েও আদম কেন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে গেল? আবার

উলঙ্গ হবে না বলা হলেও তারা উলঙ্গ হয়েছিল (৭:২২) জনাব! বলুন তো নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সাথে আদম দম্পত্তির যৌনাঙ্গের সম্পর্ক কি? আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে ফল খাওয়ায় হয়তো পাপ হয়ে থাকতে পারে—আর তাতে মৃত্যু নির্ধারিত হতে পারত। কিন্তু তা না হয়ে ওদের যৌনাঙ্গ প্রকাশের রহস্য কি? এসব প্রশ্ন করায় আবার আরজ আলী মাতব্বরের মত আমাকেও "অশিক্ষিত গেঁয়ে ভূত" বলবেন না তো? মর্জি আপনার!! আপনার মত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গবেষক ও পুস্তক ব্যবসায়ী হতে পারিনি। সুতরাং যা বলবেন তা-ই শিরোধার্য। কেননা আমরা পাঠক আর আপনারা লেখক-ব্যবসায়ী। আপনি লিখেছেন, "মাতব্বর নিজে কি দর্শন কাকে বলে বুঝতেন? পৃথিবীর সব দার্শনিক-ই তার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন। আরজ আলী মাতব্বর কতটুকু গণিত জানতেন?" (পৃঃ ১৯)। মহাবিবেচক! আমার গুরু বলেন, "আমরা মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ্‌ বনে যাই।" যেমনটি হয়েছেন আপনি। আপনাকে আমার 'বিদ্যাঅহংকারী' মনে হয়েছে। আমি বলতে চাই, আরজ আলীর সমালোচনা করার যোগ্যতা আপনার নেই। আরজ আলী একজন মুক্ত-চিন্তার মানুষ ছিলেন। (না বা তাকে দার্শনিক বললাম; আরজ আলীকে দার্শনিক বললে তো আপনার খুব ঘেন্না হয়) অপরদিকে, আপনি বদ্ধ-চিন্তার ধারক ও বাহক। আপনি বিশ্বাস করেন জ্বিন-ভূত (পৃঃ ২০১)। অশরীরি এ জীবগুলো ৯৮% ক্ষেত্রে সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভর করে। আপনার বিশ্বাস এ সুপার পাওয়ার জীবগুলোর বুঝি নারীদেহের জ্যামিতিক বিন্যাস খুব পছন্দের!!

আরজ আলী দর্শন বুঝতেন কি না জানি না; তবে আপনি দর্শনের 'দ' জানেন না। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এটুকু বুঝি, যারা দর্শন বুঝেন তাঁদের অভিধানে 'অলৌকিক' শব্দটি থাকে না। থাকার কথা নয়। আপনি কোরআনকে সম্বল করে যে সব পুস্তক রচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ 'আবেগ-তাড়িত'। আরজ আলীর প্রশ্নগুলোকে (রচনা) মৌলিক বলা চলে। আমার জানা মতে, আপনার কোন মৌলিক রচনা নেই। আপনি 'নারীর মন' কে মৌলিক রচনা বলতে চাইলে সে বিষয়ে পরে আসছি। আমি একজন ক্ষুদ্র পাঠক। সেক্স কাহিনী থেকে শুরু ক রে কোরআন কাহিনীতে আমি বিচরণ করতে ভালোবাসি। তবে এর মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞান অধিক প্রিয়। এ পর্যন্ত আমি যা কিছু পড়েছি-বুঝেছি-শুনেছি-তাতে **পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক (ব্যক্তিগত বিবেচনায়) মুহম্মদ (সঃ)**। তিনি গণিত জানতেন না। ছিল না তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া। তারপরও **রচনা করেছিলেন মৌলিক অথচ শ্রেষ্ট**

**দর্শন-গ্রন্থ**। তাঁর দর্শন-শাস্ত্র, কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা করে, মিথ্যাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়ে এখন আপনাদের ব্যবসা চলছে।

**কোরআন বিকৃতির** কয়েকটি **নমুনা** দিচ্ছিঃ (১) মালিকি ইয়াওমিদ্দিন (১:৩) [প্রচলিত বঙ্গানুবাদ]-কর্মফল দিবসের প্রভু/বিচার দিনের মালিক। এখানে, মালিক অর্থ প্রভু, স্রষ্টা; ইয়াওম অর্থ সময় এবং দ্বীন অর্থ ধর্ম। সুতরাং কিভাবে 'বিচারদিনের মালিক' হল তা বোধগম্য নয়। সমগ্র কোরআন শরীফে পরকাল বুঝাতে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—১. আখিরাত ২. কিয়ামত। মজার ব্যাপার হলো এ শব্দ দুটোর একটিও কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে নেই। (২) কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (১১২:১) বল, তিনি আল্লাহ্ অদ্বৈত/ বল আল্লাহ্ এক। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'আহাদ' শব্দটি দ্বিবচন। আমাদের ধর্মগুরুরা (?) উল্লেখিত আয়াতের কি ব্যাখ্যা দেবেন?

(৩) স্বঘোষিত আল্লামা, মুফতি, ফতোয়াবাজরা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে জায়েজ করেছেন। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ উল্লেখ রয়েছে। অথচ কোরআন খুলে দেখুন সংশ্লিষ্ট আয়াতটি একটি শর্তযুক্ত বাক্য (conditional sentence)। যে শর্ত কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই শর্ত পালন সাপেক্ষে মুসলমানগণ চারটি বিয়ে করে কি? নাকি জৈবিকতা মেটাতে ৪ জন নারী খুবই প্রয়োজন?

(৪) ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কাদর—আমি এটি অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে/ আমি কোরআন নাযিল করেছি মর্যাদাপূর্ণ এই রাতে। সমগ্র কোরআন শরীফে 'কোরআন' এবং 'ফুরকান' শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে ইঙ্গিত করা হলেও উল্লিখিত আয়াতে এ শব্দ দুটোর উল্লেখ নেই। তবুও অনুবাদে অথবা ব্যাখ্যায় কেন আমাদের এসব কথা শোনানো হচ্ছে? এগুলোকি কোরআন বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে না।

(৫) আপনি কি জানেন, পবিত্র কোরআনে বস্তুগত দানকে 'যাকাত' বলা হয় নাই। তবে যাকাত কি?

একমাত্র ইনকিলাবী গোষ্ঠীরা লিখে থাকে, 'নাস্তিক আরজ আলী'। এমন হতেই পারে। কারণ ওরা ধর্মব্যবসায়ী। নাস্তিকবাদের তত্ত্বকথা ওদের জানা নেই। কোরআনের কোথাও বলা নেই, মুহম্মদ (সঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। বরং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ইব্রাহিম (আঃ)। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে এর বর্ণনা রয়েছে। আর **হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন নাস্তিকবাদের গুরু।** 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এখানে 'লা'-মানে 'নাই'। এর উপরে আবার দীর্ঘ মদ্দ

রয়েছে। দীর্ঘ মদ্দের তাৎপর্য হল 'চিরস্থায়িত্ব' অথবা 'অসীমত্ব'। এটি দ্বারা কখনও 'চার আলিফ' মাত্রা টেনে পড়া বোঝায় না। সুতরাং যা নেই তা-ই নাস্তি। এই নাস্তিকবাদ বা নিরাকারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সকল মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন।

আরজ আলীর প্রশ্ন করাকে আপনি "বুনো এবং বেয়াদব সুলভ অগভীর প্রশ্ন" বলে মন্তব্য করেছেন। আরো লিখেছেন, "তার মতো বোকামিপূর্ণ প্রশ্ন করত সেই আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক সফিষ্টরা।" আড়াই হাজার বছর আগের সফিষ্টদের আপনি বোকা বলেন, অথচ একুশ শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসমাবেশে দাঁড়িয়ে আপনি 'সোলায়মানী তাবিজের কেতাব' ব্যবহার করেন নারীদেহের ভার মুক্ত করতে। হাস্যকর বটে!

মহাবিবেচক! আমরা সত্য জানতে। কিন্তু **'সত্য কি (?) আমরা তাই-ই জানি না।** 'সদা সত্য কথা বলবে' কাব্যকলার সংলাপ মাত্র! এর মধ্যে কোন সত্য নেই। সত্যকে তৈরি করা যায় না; তা আবিষ্কার করতে হয়। সত্য কখনো অলৌকিক হয় না।

"'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ এবং 'মুসলিম' মানে হলো আত্মসমর্পণকারী।"(কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল.....পৃঃ ২৩)। আত্মসমর্পণের নামে আমরা যে 'দর্শন' চর্চ্চা করে চলছি তাকে বিলাসিতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। নিরাকারতত্ত্বে বিশ্বসীগণকে কোরআন তিনভাগে ভাগ করেছে। যথা: আমানু, মুসলিম এবং মুমিন। কোরআনের সকল আদেশ 'আমানু' কে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছে। বিপরীতে মুমিনকে উদ্দেশ্য করে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কেননা তারা নির্দেশের উর্দ্ধে থেকে আল্লাহ্‌র কাজ সম্পাদনা করে থাকে। বিজ্ঞজন! আপনাকে কোন পর্যায়ভূক্ত করব।

আপনার ঈশ্বর বন্দনা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-নিন্দায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা আমরা কোন আবেগপ্রবণ ঈশ্বরের উপাসনা করি না। পৃথিবীতে মানবজাতির ওপর যদি কোনো বিপর্যয় নেমে আসে, তবে তা আমাদের কর্মের দরুণ। তকদীর বলতে ভাগ্য বুঝায় না। তকদীর মানে 'কর্মবৃত্ত'। মানুষের ভালমন্দ অবস্থা তার কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। **পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য বলতে কিছু নেই।** নিজ কর্ম দ্বারা মানুষ যা অর্জন করে, তার দায়ভার সম্পূর্ণ মানুষের। এখানে আল্লাহ্ কোন হস্তক্ষেপ করেন না। তবে কেন আপনি লিখেছেন, "আল্লাহ্‌র আক্রোশ"। ঈশ্বরের টুটি চেপে ধরতে বুঝি আপনার একটুও বাঁধল না। এভাবে কেন আল্লাহ্‌র মহিমাকে সংকুচিত করছেন? **আল্লাহকে তো আমরা এখন পর্যন্ত কল্পনা ছাড়া অন্য কোথাও স্থান দিতে**

**পারিনি। কল্পনার মূর্তিতে কতখানি গুণ/দোষ আরোপ করা যায়?** ততখানি (?) যতখানি হিন্দুরা তাদের ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে? সুতরাং বিরত থাকুন এমন আষাড়ে গল্প লিখন থেকে।

'চলার পথে যথ সুন্দরী নারীকে দেখেন না কেন, তার দিকে একবারের বেশি কখনও তাকাবেন না (পৃঃ-২০৮)।' আপনার এ ফতোয়ার মর্ম বুঝলাম না। একবারের বেশি তাকালে কি পাপ হবে? তবে একবার তাকালে কেন পাপ হবে না? বাদ দিন ওসব, আগে বলুন—পাপ কি? জানি এসব আপনার কাছ থেকে আশা করা বাতুলতা মাত্র। 'নারীর মন' শিরোনামে যা রচনা করেছেন তাকে কি বলব? আমাদের সমাজে নারীরা কত নিগৃহীত তা বলার অপেক্ষা রাখে না! তখন এ ধরনের রচনা তাদেরকে শুধু "যৌনদেবী" তৈরি করতে ভূমিকা রাখতে পারে মাত্র। নারীর মন নিয়ে যেভাবে টানা হ্যাঁচড়া করছেন, তাতে অল্পদিনের মধ্যে আমাদের নারীসমাজের সকল সামাজিক মর্যাদা, চাওয়া-পাওয়া ভেস্তে যাবে। তাই বলছিলাম কি; একজন নারীকে নারী হিসেবে ট্রিট না করে প্রথমে 'মানুষ' হিসেবে ভাবুন। সম্ভবত এ ভাবনা-ই নারীমুক্তির জন্য যথেষ্ট। দেখুন না আমাদের নারীবাদীদের আন্দোলনের শ্রী!! নারীর বর্তমান "গিট্টু লাগা অবস্থা"র জন্য আমাদের নারীবাদীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।

আপনার জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা নিয়ে কি 'কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল .....' বইটি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? 'পরকীয়ার রহস্য' উদঘাটন করতে গিয়ে আপনি প্রত্যক্ষভাবে সকল পুরুষকে পরকীয়ায় আসক্ত বলেছেন। আর নারীরা বুঝি ধোয়া তুলসী পাতা! আমাদের সমাজে 'রাজকীয় বেশ্যা'র কমতি নেই। যারা স্বামীর ছত্রছায়ায় পর পুরুষকে দেহদান করে শুধুমাত্র জৈবিক তাড়নায়। আমি ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কাকরাইল হয়ে কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান সফরে গেলাম। এদিকে আমার 'স্ত্রী'র খোপায় দাঁড়োয়ান ফুল গুঁজে দেয়। ছেলে রাত কাটায় পতিতার উষ্ণতায়। মেয়ে বাহুডোরে বাঁধে পছন্দের ড্রাইভারকে। ('ড্রাইভার' বলতে যন্ত্রচালক নয়, মেয়েটি যে ছেলে দ্বারা ড্রাইভ হয়) বাস্তবতা কি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু? বছরখানেক আগে আমার দুই বন্ধু কমলাপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল একটু আড়াল দূরত্বে। কোথা থেকে একজন (আপনার কথিত, নারী কেন সুন্দর? কে এই নারী) নারী এসে বলল, "লাগাবি, মাত্র বিশ ট্যাকা। ওদিকে ফাঁকা ঘর আছে"। এবার খুলুন আপনার 'নারীর মন' পান্ডুলিপি। আমাদের সমাজে কোন নারীর ভূমিকা দ্বিমুখী হলে, তাকে 'ছলনাময়ী' বলা হয়। কিন্তু আপনি লিখেছেন, "অনেক সাহিত্যিক গর্দভ এই রহস্য না বুঝতে

পেরে নারীকে ‘ছলনাময়ী’ নামে আখ্যায়িত করে (পৃষ্ঠা-১৭৯)।” জনাব! কোন্ রহস্য বুঝতে পারেন নি তারা? আপনি যা বুঝেছেন—তা তাদের বুঝিয়ে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। তাই বলে এমন ভাষা প্রয়োগ করবেন!

অনেক আলোচনা করলাম। যে কোন প্রকারান্তে আপনি নিজেকে ‘ঈশ্বর-প্রেমিক’ হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। আপনার বাসনা যেন আরো বিকশিত হয় সঠিক জ্ঞানের ফাল্গুধারায় এই কামনায় শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

‘জ’

সুপ্রিয় জনাব,

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমি আপনার চিঠির জন্য কষ্ট পেয়েছি, কারণ আমার মতো এত ক্ষুদ্র একজন ব্যক্তির কাছে লিখতে গিয়ে আপনি এত কষ্ট করেছেন; আনন্দ পেয়েছি, কারণ আপনি আপনার ধারণায় যা সত্য তাতে অটল থাকতে গিয়ে আমাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি, যদিও আমি আপনার একজন 'প্রিয় লেখক'; এবং হতাশ হয়েছি, কারণ আল্লাহ্ ও কোরআন সম্পর্কে আপনার ধারণায় ভ্রান্তি রয়ে গেছে, যে দোষ প্রথমত আপনার নয়।

আমি এ পর্যন্ত শত শত চিঠি পেয়েছি। তা আপনার অনুমান করারই কথা। কারণ একজন 'বিখ্যাত লেকখ' তা না পেয়েই পারেন না। কিন্তু একটা চিঠিরও উত্তর দিয়েছি কিনা তা মনে পড়ে না। কারণ সময়ের অভাব। তাছাড়া আমি মনে করি যে আমি এমন কোনো ব্যক্তি নই যার কিছু বাক্য কারো জন্য তার ব্যক্তিগত জগৎকে উদ্ধার করে দেবে। কিন্তু আপনি আমার বই প'ড়ে কষ্ট পেয়েছেন। মর্মাহত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমার বই আপনাকে কিছু নৈতিক কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। আপনি অস্থির হয়েছেন। এজন্য জবাব দেয়া দায়িত্ব ব'লে মনে করলাম। তাছাড়া আপনার হাতের লেখার মতো আমার হাতের লেখাটা অত সুন্দর নয়। অবশ্য এখানে 'অত সুন্দর ' কথাটার কোনো অর্থই নেই। আমার লেখা সুন্দরই নয়। এখন দ্রুত লিখতেও পারি না। লেখার চেয়ে চিন্তা দ্রুততর হয়ে যায়। যাহোক, এটা আপনার চিঠির জবাব নয়। এ হলো একটি শান্তনামাত্র। আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন, তা আমার কাছে এত বেশি মূল্যবান যে আমি এই সামান্য পরিসরে সে ব্যাপারে কিছু লিখে তাকে তার 'জবাব' বলে চিহ্নিত ক'রে প্রশ্নগুলোর গুরুত্বকে ছোট ক'রে দেখব না। আমি প্রশ্ন ভালোবাসি। সঠিক প্রশ্নটা করতে জানলে জগতের সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞানটাও পাওয়া যায়। যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন, 'Knock! and the door will be open unto ye.' এখানে knock করা মানেই প্রশ্ন করা। জগতে সবাই প্রশ্ন করেছেন, জবাবও পেয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নের ফিলোসফি নিয়ে কেউই ভাবেননি। যে বইটি আপনার মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে তাতেও আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। শুধু প্রশ্নের ফিলোসফি নয়, তার সাইকোলজি নিয় আলোচনা হয়তো একদম হয়নি, কিছু হিন্দু সাধকদের দ্বারা ছাড়া। আমার গোপন মৃত্যু ও নবজীবন (২য় খণ্ড) দেখতে পারেন।

কোরআনে বলা হয়েছে যে মানবজাতির যে বর্তমান ধারাটা টিকে আছে , যাদের ওপর আল্লাহ্ তাঁর পৃথিবীর গবেষণাগারে উপযুক্ত মন গঠনের পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাচ্ছেন, তারা সৃষ্ট হয়েছে একটিমাত্র ব্যক্তি থেকে (পুরুষ)।

> তিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা যুমার: ৬)

তাঁর থেকে সৃষ্ট হয়েছেন তাঁরই স্ত্রী। অন্য কিছু আয়াতে তিনি বলেছেন যে গোটা (আধুনিক) মানবজাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন (সেই)এক নারী ও এক পুরুষ থেকে, যেমনঃ

> হে মানুষ! আমি তোমাদের একপুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক সাবধানী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

(সূরা হুজোরাত: ১৩)

এই একপুরুষ হলেন কোরআনে কথিত আদম (আঃ)। কোরআনে হাওয়া (আঃ) এর নামটি নেই—তা আছে বাইবেলে (ঈভ্)। আদম-হাওয়া নাম দুটোও কিন্তু প্রতীকী—অবশ্য সব নামই প্রতীক—তবে তাঁদের প্রকৃত নামও ছিল এরূপ বা অন্তত এই নামের কোনো ধাচের linguistic backward extrapolation। ভাষার বিবর্তনের সাথে তা আরবিতে এসে এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। (ভাষার বিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার কিছুটা জানার জন্য "*কোরআনের অলৌকিক উচ্চারণ এবং....."দ্রঃ)*। তা না হলে গ্রীক *আলফা, বেটা, থেটা*......ইত্যাদির সাথে আরবি *আলিফ, বা, তা* .....ইত্যাদির মিল-এর ইতিহাস এবং বিবর্তনের বিশ্লেষণ ভাষাতাত্ত্বিকগণের কাছে কোনো মতেই গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হতো না। কোনো ঘটনাবলি ঘটার ***আগে*** তাদেরকে ছেড়া-ভাঙ্গা এবং অনিশ্চিত মনে হলেও এবং ঘটনাগুলিকে ইচ্ছেকৃতভাবে যে-কোনো দিকে প্রবাহিত করার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে ব'লে ধ'রে নিলেও, সেগুলি ***ঘটার পরে*** তাদের বিভিন্ন প্রাপ্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ টুকরোর মধ্যেও যে মিল এবং পূর্বপরিকল্পিত ধারাবাহিকতার আলামত পাওয়া যায়, তখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে পূর্বাপর্য ধারাবাহিকতা ছাড়া যেমন কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না, তেমনি ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি ছুটে যাওয়া ছাড়া প্রারম্ভের

কোনো ঘটনার পক্ষে ঘটা এবং ঘটতে ঘটতে এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। **যা পূর্বনির্ধারিত তাকেই সম্মুখ বলা হয়।** কোনো ***দিকে*** মুখ ক'রে দাঁড়ানো বা এগোতে শুরু করা মানেই হলো সেই ***দিকটির*** উপস্থিতিকে দাঁড়ানো বা চলার আগেই সত্য ধ'রে নেয়া। অর্থাৎ *প্রকাশিত বাস্তবতার* সব পরিণতি তার শুরু দ্বারাই পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বনির্ধারণ দ্বারা গতিপ্রাপ্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব অগ্রসর শাখাগুলিতে *টেলিওলজির*(Teleology) এই হেয়ালি এখন একবাক্যে স্বীকৃত—এবং ফিজিক্সের বিভিন্ন শাখাতেই প্রসঙ্গটি বারবার আসছে। ভাষাতত্ত্বের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলি সময়ের পূর্বাপর্যের ধারাবাহিকতাকে লিখিত ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের চেয়েও বেশি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সুতরাং যে-কোনো মাইলফলক 'নাম' ইতিহাসের একেকটি তথ্যপূর্ণ নিদর্শন। অবশ্য কোরআনে বরং একথা বলা নেই যে কেবল আদম সন্তানেরাই মানবপদবাচ্য। এমনও হতে পারে যে তারও আগে বিবর্তনের উজানে অন্যান্য মানবজাতিও ছিল। কোরআনে তেমন ইঙ্গিতও আছে [(যেমন: ২৩:৫২) —যেখানে বলা হচ্ছে যে **বর্তমান মানবগোষ্ঠী** একটাই জাতি—আদম (আঃ) বংশধর যারা নূহ (আঃ) থেকে বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞকে অতিক্রম ক'রে টিকে আছে—এর আগে আরো কোনো **একই জাতি** ছিল কি না তা এখনও স্পষ্টভাবে আমরা জানি না]।

> এবং তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি, এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক।
>
> (সূরা মোমেনুন: ৫২)

> সকল মানুষ একই উম্মত (জেনেটিক বিচারে এক গোত্র, আবশ্যিক জেনেটিক বৈচিত্র্য সহ) ছিল। তারপর আল্লাহ্ নবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাজিল করলেন যাতে মানুষের মাঝে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তার **মীমাংসা** করতে পারেন।
>
> (২:২১৩)

শুধু তাই নয়, কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিজ্ঞান-কথিত জৈবিক বিবর্তনের (Evolution) মধ্যে ফেলে। *(দ্রঃ কোরআন ও জেনেটিক্স)।* ফলে **দেহ কাঠামোর বিচারে** মানবজাতির যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন পিতা ছিল। কখন কিভাবে আল্লাহ্ উপযুক্ত কাঠামোর মধ্যে তাঁর রূহ—অর্থাৎ আদম (আঃ) এর soul টাকে—পাঠালেন, সেটা ভিন্ন বিষয়। এতকাল—শতাধিক বছর ধ'রে—ধার্মিকেরা তো স্বীকারই

করতে পারেনি যে বিবর্তন সত্য (অথচ হিন্দুধর্মের জন্মান্তরবাদের মূল *প্রতীকবিহীন* সত্যটি এই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই নির্দেশ করে), উপরন্তু তারা বিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্বেরই বিরোধিতা করেছে, এবং এখনও করছে। অথচ তারই মধ্যে আমিই প্রথম সৎসাহসে *বিস্তারিতভাবে* সত্য কথাটাকে বলেছি।

আপনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া বিষয়ক যে আয়াতটা তুলে দিয়েছেন তা হলো একটি রূপক আয়াত। এর বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা রয়েছে—জৈবিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, এবং সামাজিক। আর এর implication রয়েছে জীবকুল সৃষ্টির সব পর্যায়ে। ঠিক এই জাতীয় আয়াতকে লক্ষ্য ক'রেই আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন যে কিছু লোক তর্কের জন্য এগুলোকেই উপস্থাপন করবে—এবং তা করবে বিভ্রান্ত দার্শনিকরা।

> তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি **রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফেৎনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।** বস্তুত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। এবং যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি।' সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। বস্তুত বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।
>
> (সূরা আল-ই-ইমরান: ৭)

প্রিয় বন্ধু, 'গন্ধম' শব্দটা folklore থেকে নিয়েছি, সাধারণ মানুষের কাছে রেফারেন্সের সুবিধার জন্য। স্বয়ং আল্লাহ-ই তো একটি 'বাঁকানো' বাস্তবতাকে রূপক দ্বারাই প্রকাশ করেছেন। এটা কোরআন বিকৃতি নয়। আমার কথা না বুঝে আপনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। Hasty generaliztion হলো logic এর সবচেয়ে বড় অপপ্রয়োগ। রূপক সম্বন্ধে একটা কথা সব সময় মনে রাখা দরকার—রূপক ব'লে কিছু নেই, যা কিছু রূপক, তাই-ই বাস্তব—কোনো না কোনো ডাইমেনশনে তা বাস্তব, যা কিছু রূপক, এবং অন্যান্য **নিম্নতর বা স্থূলতর ডাইমেনশনে** তা রূপক। **এক ডাইমেনশনের সত্যকে যখন অপেক্ষাকৃত concrete ডাইমেনশনে প্রকাশ করতে হয়, তখন তা আবশ্যিকভাবে একটা যৌক্তিক কাঠামো লাভ করে। একেই বলে রূপক।** শিশুদের রূপকথাগুলো মূলত শিশুর ভবিষ্যৎ-মুখী বিকাশের প্রেরণা-জাত কল্পনার চিত্ররূপী প্রকাশ। ফলে তা রূপক। কিন্তু শিশুর মনের মধ্যে কল্পনার যে বাস্তবতা কাজ করছে, তা ঐ **বাস্তবতার বিধান** অনুযায়ী ১০০% বাস্তব। এই বিচারে অলৌকিক বলে কিছু নেই। কথাটা

আমারই বলা (*কোরআনের আলোকে আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস ও অলৌকিক সান্নিধ্যলাভ এবং অন্ধাকারের বস্ত্রহরণ দ্রঃ)*। সুতরাং ‘গন্ধম’ খাওয়ার ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। প্রেমের, স্বাধীনতার, জ্ঞানের, আয়ুর, এবং বিশুদ্ধ চিন্তার ডাইমেনশনের অর্থগুলো আমার জানা আছে। এর বাইরের কোনোকিছু এখনও আল্লাহ্ আমাকে জানাননি—নিশ্চয়ই তার জন্য আমি এখনও উপযুক্ত হইনি। আপনি এমনভাবে কথাটা বলেছেন যেন আপনি তার ‘আসল’ অর্থটা জেনেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে আপনার জ্ঞানটাকে reality-র কোরআন-কথিত ৭টি মাত্রায় বা বিজ্ঞান-কথিত (আপাতত) ১১টি মাত্রায় project ক’রে দেখবেন *সহজবোধ্য* সবক্ষেত্রে তা consistent এবং valid অর্থ দেয় কিনা। ‘সবক্ষেত্রে’ কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। Completeness ছাড়া কোনো logcial field গ’ড়ে ওঠে না। আমি যা বলেছি, বাহ্যিক স্তরের জন্য তা মানানসই, বরং আমি সব সেখানে বলিনি। কারণ আমি মূলত একটা কথার reference হিসাবে বিষয়টাকে চিহ্নিত করেছি মাত্র—যারা তার কিছু অর্থ জানেন বা যারা চিন্তাশীল তাদের চিন্তার মসলা যোগানোর জন্য, বিষয়টার পূর্ণাঙ্গতার খাতিরে তাকে আলোচনার পটে তুলে আনার জন্য নয়। বাইরের ডাইমেনশনের আয়াতের ঘটনাটাকে **আক্ষরিক অর্থে** সত্য ধ’রে নিতে হবে। নইলে ভেতরের ডাইমেনশনগুলোর জ্ঞান ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে—তার intellectual intelligence এবং emotional intellegence (Daniel Goleman উদ্ভাবিত পদগুচ্ছ, তার দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য) এর মধ্য দূরত্ব সৃষ্টি হবে, ফলে তার mental energy তে entropy সৃষ্টি হবে, যার ফলে জ্ঞান এবং মন আলাদা আলাদা বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়বে, সৃষ্ট হবে negative reinforcement, এবং ব্যক্তি তখন জ্ঞানী হয়েও বিশ্বাস করার যোগ্যতা হারাবে। তখন যে অবস্থা হবে সেটাই তো ‘গন্ধম’ খাওয়ার পর ঘটার কথা। এজন্য কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন:

> (কোনো ব্যক্তি) যা উত্তম তা বর্জন করলে....অবশ্যই আমি তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ **সহজ ক’রে দেব**।

**(৯২: ৯-১০)**

কারণ সে তার মূল্যবান energy কে ভারসাম্যহীন পথে ব্যয় করার ফলে এনার্জি ব্যারিয়ারে পতিত হবে। সে আর সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না, পরকালে দোজখেও একই ঘটনা ঘটবে। কুয়োর ব্যাঙ আজীবন লাফিয়েও কুয়ো থেকে বের হয়ে আসতে পারে না কেন? কারণ সে কুয়োর

(চেয়ে ছোট) মাপের লাফ দেয়। কিন্তু তার পরও তার মনে হয় যে সে সঠিক মাপের লাফ দিচ্ছে, সে সঠিক পথে আছে। একথা কোরআনে বারবার (বারবার!) বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ্ বলছেন যে, 'তাদের চোখ দেখে না, কান শোনে না'। 'তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে'। ফলে ব্যক্তি তখন যা জেনেছে তাই-ই তার ক্ষতির কারণ হয়। তার নলেজই তার অন্ধত্বের কারণ হয়। সে নিজেরই assumption এ আটকে যায়। তার দ্বারা আর creative চিন্তা সম্ভব হয় না। Development এবং Evolution থেমে যায়। Survival হয়ে যায় হুমকির সম্মুখীন। **টিকে থাকার** খেলায় সে হেরে যায়। গোটা জীবন-মৃত্যুটাই টিকে থাকার খেলা (দ্রঃ *কোরআন ও জেনেটিক্স্)।*

একেই বলে **পরাধীনতা**। কারণ ব্যক্তি তখন তার **ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে** আটকে যায়। **'মুক্তচিন্তার' মানুষেরা সবাই মুক্ত নয়। অনেকেই তাদের নিজস্ব চিন্তার হাতে বন্দি**। একটামাত্র সেকেন্ড নিজেকে ঠিক **এই বর্তমানে** চিন্তামুক্ত অবস্থানে ধ'রে রাখতে গিয়েই মানুষ বুঝতে পারে যে সে ইচ্ছে ক'রেও চিন্তাকে থামাতে পারে না। কিন্তু চিন্তা যাদের করায়ত্ত, তাদের নামাজ বিশুদ্ধ, ধ্যান চিন্তার ময়লামুক্ত। বিষয়টাকে বুঝতে হলে Knowledge Trap কাকে বলে তা জানতে হবে। কিন্তু তা এই মুহূর্তে আপনার নাগালের বাইরে, যেহেতু ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হলেও term টা এখনও প্রচলিত নয়। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার যে ব্যাখ্যার কথা আপনি জানেন (এবং চূড়ান্ত সত্য ব'লে জানেন) তা কি আমি বলব আপনাকে? আপনি 'বৃক্ষ' বলতে দেহ বুঝাচ্ছেন। ফলে বৃক্ষের কাছে যাবার কারণে আদমের (আঃ) body-consciousness চ'লে এল। —অবশ্যই এটা সত্য কথা। আমি তো কোরানিক সেল্‌ফ কন্ট্রোল.....-এ একথাই বলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তা যদি হতো, তাহলে আল্লাহ তা সহজেই বলতেন। 'বৃক্ষ' যেমন একটি প্রতীক, তেমনি 'দেহ' ও একটি প্রতীক। **আধ্যাত্মিক বিচারে** 'দেহ' স্রেফ একটি প্রতীক। সুতরাং বৃক্ষ থেকে দেহের প্রসঙ্গ এলে বড়জোর একটু বেশি specific পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু তার পরও আমরা সেই প্রতীকেরই বলয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেতে বাধ্য হই। এর আসল সাইকোলজিক্যাল রহস্যটা আপনি এখনও জানেননি।

সুতরাং কাউকে তার নিজেরই সাধনা (আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তারই মাধ্যমে জ্ঞান সাধনা) দ্বারা রূপক ভেদ করার সুযোগ এবং পরিস্থিতি তৈরি না ক'রে দিয়ে তাকে তার সূক্ষ্মতর ডাইমেনশনের অর্থ ব'লে দিয়ে সে কাজের মানুষ না

হয়ে হয়ে যাবে কথার মানুষ। তখন সে সত্যকে অবলম্বন করার চেয়ে তা নিয়ে আলোচনা করতেই বেশি পছন্দ করবে। এজন্য কোরআনের বাণী এভাবে স্তরে স্তরে ভেতরমুখী ক'রে সাজানো। মানুষের মনও ঠিক এভাবে নিয়ম-বাস্তবতা—ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্থুল-থেকে-স্থুল-থেকে-সূক্ষ্মতর সজ্জায় সজ্জিত। এজন্য সঠিক আচরণ ও সাধনা দ্বারা বাইরের কোনো ডাইমেনশনের দাবি পূরণ না ক'রে তার ভেতরের ডাইমেনশনের জ্ঞান পেয়ে গেলে সে হয়ে যায় শব্দভূক কবি বা শব্দবিলাসী তার্কিক। একারণেই আগের যুগের গুরুগণ তাঁদের শিষ্যদেরকে হুট ক'রে ভেতরের জ্ঞান দিয়ে দিতেন না। বর্তমানে তা দেয়া হচ্ছে ব'লেই দেখা যাচ্ছে যে এখন 'সত্যকে জানা নাস্তিকই' বেশি। অবশ্য যে সব 'গুরু' সেই জ্ঞান প্রচার করছেন সেই জ্ঞানের আচরণ-সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রচার ছাড়াই, তারা তা জেনেছিলেন শুনে শুনে, সাধনার মাধ্যমে নয়। মনে রাখা দরকার যে সত্যকে জানলেই পার পাওয়া যাবে না, বরং তখন তাই-ই কঠোর শাস্তির কারণ হবে—কারণ মৃত্যুর সময়ে তখন নিজের মনকে একথা বলতেই বাধ্য হতে হবে—আহ, যা জেনেছিলাম তাই তো সত্য হলো, অথচ তা অনুসারে না চলার কারণে আজ সব হারাতে হলো! গতকাল এক স্কুলের এক ইংরেজি শিক্ষকের সাথে কোনো এক প্রকাশকের দপ্তরে দেখা হয়েছিল। তিনি নামজ পড়েন না, বিধান অনুসারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করেন না। নিজেই মারেফতের প্রসঙ্গ তুলে কিছুক্ষণ পর নিজেই বললেন—দরকার কী এসব জানার? সবই তো শূন্য!—নিশ্চয়ই তিনি কোনো দিগ্‌ভ্রান্ত গুরুর শরণাপন্ন হয়েছেন। তখন তার কাছে বিধানের চেয়ে জ্ঞান বা মারেফতকে বড় মনে হয়েছিল, এখন তার কাছে জ্ঞানকেই তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তা হবেই না বা কেন তার জ্ঞান তো তার আর কোনো কাজে লাগছে না—তা তো তার **মুখস্থ** হয়ে গেছে। তার জ্ঞান তার আবেগগুচ্ছকে স্বভাবধর্মের অভিমুখে সাজিয়ে দিতে পারেনি। সেই সাজানোর কাজে তাকে যে এনার্জি ব্যয় করতে হতো, তা তিনি ব্যয় করেননি ব'লে তা তাকে সত্য থেকে দূরে রেখেছে, তার বোধের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন যে তিনি নিজেই অবাধ্যদের অন্তরে আবরণ ফেলে দেন। অথচ এই জাতীয় আয়াত তাদেরকে শোনানো হলে তারা বলে—সবই তো তিনি একাই করেন, তাহলে আর আমার কী দোষ? যে শিক্ষকের কথা বললাম, তিনিও ঠিক একথাই বলেছিলেন। সুতরাং 'সত্য জানতে চাই' বলার চেয়ে তা মানাই জরুরি। অন্যের কাছে তা জানতে চাওয়ার দরকার কী? তা তো প্রকাশ করাই হয়েছে। কোরআন তো প্রকাশ গ্রন্থ, গোপন গ্রন্থ নয়। তবুও তার জ্ঞানটা গোপন। কারণ কী? প্রকাশ্যে কেউ তা না মানলে তার

গোপন জ্ঞান তার কাছে প্রকাশিত হবে না। বরং গোপন গ্রন্থ হলো ইহুদী ও হিন্দুদের। তা বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেছে। এখন গ্রন্থ প্রকাশিত বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে সবাই তা ছুঁতে বা আমল করতে পারে না। এদের বিরুদ্ধে কোরআনে স্পষ্ট আয়াতও আছে। দেখুন ভাই, কে কোথায় যাব তা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি সত্য কী। সুতরাং 'সত্য কী আমরা তাই জানি না' একথা বলার চেয়ে বড় বিভ্রান্তিকর নিদর্শন আর নেই। কারণ একথা বলা মানে হলো নাজিলকৃত সত্যকে অস্বীকার করা। বরং আসুন আমরা ধান থেকে তুষ, মাছ থেকে কাঁটা, সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করার জন্য যারা নিজেদেরকে 'ভিন্ন মতাবলম্বী' ব'লে মনে করি তারা সমবেত হই। প্রকাশিত যে সত্যের সাথে মিথ্যা সবচেয়ে বেশি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে তা হলো মানবদেহ। সে যা গ্রহণ করার তা ত্যাগ করতে চায় আর যা ত্যাগ করার তা গ্রহণ করতে চায়। শুধু তাই নয়, সে এক পর্যায়ে গ্রহণ-বর্জনের বিধান এবং বৈধতা-অবৈধতার সংজ্ঞাও পাল্টে ফেলে।

'কোরআন বিকৃতি' কথাটা উচ্চারণ করাই হারাম। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে এই কোরআনকে কেউ পরিবর্তন করতে অর্থাৎ বিকৃত করতে পারবে না বা তা কারো ক্ষমতাধীন নয়:

> যখন আমার বাক্য যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা বলে, 'এ ছাড়া অন্য এক কোরআন আনো অথবা একে বদলাও।' বল, 'নিজে থেকে এ বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি।'

(সূরা ইউনুস: ১৫)

> তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থ আবৃত্তি কর। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তুমি কখনই তাঁর ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় পাবে না।

(সূরা কাহাফ: ২৭)

কেন তিনি তা বলেছেন? কূপমণ্ডুক ধার্মিকরা বুঝতে পারে না যে এই কথাটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বরং বলেছেন অন্য কথা—পারলে একটি আয়াত/অনুরূপ দশটি আয়াত রচনা

করে আন; গোটা জ্বিন ও মানব জাতি মিলে এর মতো কিছু আয়াতও রচনা করতে পারবে না—ইত্যাদি (এই অর্থে কোরআন কিন্তু অলৌকিকও বটে! যদিও আপনি অলৌকিক বিশ্বাস করেন না)। কোরআনকে যে কেউ পাল্টাতে পারবে না একথা আল্লাহ্ বলেছেন আমাদেরকে এই আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য যেন আমরা কখনও না বলি যে নাজিলকৃত মূল কোরআন এখন আর নেই। এক দল কি এ কথা জোরে সোরে বলছে না যে "মূল কোরআন এখন আর নেই?" আল্লাহ্ কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছেন। চিন্তা করতে গিয়ে তো মানুষ তার একেকটি কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সন্ধান করবে। তা করতে গিয়ে যে বিশ্লেষণী আলোচনার সৃষ্টি হবে, তার কোনো অসমাপ্ত অংশকে কি আপনি কোরআন-বিকৃতি বলবেন? তা বলা যদি বৈধ হতো, তাহলে তো আল্লাহ্ কোরআন নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতেই নিষেধ করতেন। আল্লাহ এও বলেছেন যে এই কোরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ভবিষ্যতে আসতে থাকবে। যেমন:

> এ (কোরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশমাত্র।
>
> এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই জানবে।
>
> (সূরা স্বোয়াদ: ৮৭-৮৮)
>
> অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।
>
> (সূরা ক্বিয়ামাহ: ১৯)

ব্যাখ্যা করতে গেলেই যদি কোরআন-বিকৃতির দায়ভার বহন করতে হয়, তাহলে কে তা করতে যাবে? এই অমূলক ভয়ের কারণে একদল ধার্মিক তো কোরআন নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করতেই চায়নি। এখনও কাঠ-মোল্লাদের হাল এরূপ। এই ভয় মানেই কোরআন অবমাননা এবং কোরআন সংরক্ষণ সম্পর্কিত আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞাকে ছোট ক'রে দেখা। এ ভয় আসে ইবলিস থেকে। তাহলে এখন ভাবুন তো—চিন্তাচর্চ্চার নামে ভ্রান্তিবশত বা অহংকারবশত কেমন অর্থহীন উক্তি ক'রে ফেলেছেন? এরূপ কথা ব'লে অযথা নিজেরই দৃঢ়বদ্ধ অজ্ঞতাকে প্রকাশ করার জন্যই কি তাহলে কিছু লোকের এত ভাসা-ভাসা লেখা-পড়া এবং জ্ঞানসাধনা? আপনি ঘটনাটাকে কোরআন-বিকৃতি না ব'লে বলতে পারতেন 'কোরআনের অপব্যাখ্যা' বা 'ভুল অনুবাদ'। কোরআনের পক্ষ নিতে গিয়ে কোরআনেরই বিপক্ষে কথা বলার কী অর্থ হতে পারে? নাকি সেক্ষেত্রে কথার অর্থের চেয়ে বরং বক্তার উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করাই বেশি যুক্তিযুক্ত? একটি কথা—কোরআন তাদের জীবনের

কোনো কাজে আসবে না ব'লে যারা মনে করে, তাদের কেউ কেউ কোরআন নিয়েই বেশি মাতামাতি ক'রে, গবেষণা করে—বলুনতো কেন? জবাবটা জানি, তবে দিচ্ছি না। যাহোক, আপনি যে উদাহরণগুলিকে কোরআন বিকৃতি বলেছেন সেগুলি কোরআনের অপব্যাখ্যাও নয়। বাস্তবতার শুধু এক ডাইমেনশন নিয়ে প'ড়ে থাকলে এই অবস্থা-ই হয়। কোরআন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

আপনার 'ইন্না আনজালনাহু ফি....' সম্পর্কিত প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে বরং একটি পাল্টা প্রশ্ন করি—আল্লাহ্ সামান্য পরিসরের মধ্যেও নিজেই নিজেকে 'আমি' 'তিনি' 'তোমাদের রব' 'তোমার রব' 'আল্লাহ' ইত্যাদি বিচিত্র নামে ও সর্বনামে কেন চিহ্নিত করেছেন, যা আমি *কোরআনের অলৌকিক উচ্চারণ এবং*.....বইটিতে দেখিয়েছি এবং যার দৃষ্টান্ত আপনি গোটা কোরআনে ভুরি ভুরি পাবেন? কেন তাঁর এক নাম শুধু 'হু' বা 'তিনি'?

'ওয়াক্বিমুস্ সালাত ওয়াতুঝ্ ঝাকাতা'—এই পদগুচ্ছের পৌনপুনিকতা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক'রে অনেকে বলে যে সালাতের সঙ্গে যেমন হৃদয়ের সম্পর্ক, তেমনি যাকাতের সঙ্গেও সম্পর্ক হৃদয়ের ও সালাতেরই। ভালোই তো। আমি কি 'প্রশান্ত আত্মায় মৃত্যুহীন....' বইটিতে 'আত্মার যাকাত' শব্দগুচ্ছটিকে ব্যবহার করিনি? দেখুন—একটি দরকারী কথা: ধ্যানের শূন্যতায় ডুবে গিয়ে শুধু একটা ডাইমেনশন নিয়েই প'ড়ে থাকা ঠিক নয়। সবই যদি শূন্য হবে, তাহলে তা নিয়ে আলাপ করারই দরকার কী? আবার শূন্যকে নিয়ে কে কী (অবশ্য সব শূন্য হলে আর "কে" "কী" এরও কোনো অর্থ থাকে না) বলল, তাতেই বা "কার""কী" আসে যায়? সব কিছুকে যদি ব্যাখ্যা দিয়ে শূন্যতার নিরাকারের দিকে চালিত করবেন, তাহলে আকারপ্রাপ্ত বাস্তবতাকে চালাতে হবে কোন বিধানকে দিয়ে? এই সুচিন্তিত এবং বই-পড়া বা ধ্যান-করা শূন্যতাপ্রীতি ইসলামের পাঁচটা ভিত্তিকেই শুধু নষ্ট করতে চায়। বিধানের বাহ্যিকতাকে যদি অস্বীকারই করলাম, তাহলে আর বাইরের জগতে বেঁচে আছি কেন? সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে 'ভেতরে' ঢুকে পড়ছি না কেন? অবশ্য 'বাইরের' বিধান না মেনে কোনো ভেতরকেই যে পাওয়া যায় না, তা বোঝার জন্য নিজে 'ভেতরে' ঢোকার জন্য সাধনা ক'রে দেখতে হয় ব্যাপারটা আসলে মুখের কথার মতো অতটা সহজ কি না। তাহলে জেনে নিন, কোরআনের যে আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বস্তুগত যাকাতের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে তা হলো:

> মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তো ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়; ওরাই সমৃদ্ধশালী।

(সূরা রুম: ৩৯)

এখানে স্পষ্টভাবে 'ধন-সম্পদ' 'সুদ' (এবং ফলে *বিনিয়োগ)* 'লাভ' এই 'বস্তুগত' শব্দগুলি রয়েছে, নয় কি? বন্ধু, আমরা অধিকাংশ সময়ে কি শুধু কথার খাতিরে কথা বলার বদ-অভ্যাসের বৃত্তে আটকে থাকি না? অহংকার এবং হিংসা দুইটাই খুব খারাপ জিনিস। মানুষ জ্ঞানার্জন করে কোমল হওয়ার জন্য। তবে *দৃঢ়তা* আর *কঠোরতা* আর *কট্টরতা* কিন্তু এক নয়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

দেখুন—আল্লাহ্ বলেছেন 'পূর্ব পশ্চিম উভয়ই তাঁর', 'তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্ আছেন', 'আমার কাছে কোরবানির মাংস পৌঁছায় না'—ইত্যাদি। তার মানে কি তাহলে এই যে পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে নামাজ পড়ার দরকার নেই, 'বস্তুগত' কোরবানী করার কোনো দরকার নেই? একটু ভাববেন কি?

আমি জ্বিন বিশ্বাস করি না শুধু, আমি জানি যে তা সত্য। আপনি 'জ্বিন' এর কোনো historical এবং anthropomorphic ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গেলে সঠিক জ্ঞানটা থেকে নিজেকেই কেবল বঞ্চিত করবেন। তবে আমি কখনও কোনো বইতে বলিনি যে আমি তাবিজ বা মেয়েদের জ্বিনে-পাওয়া phenomenon এ বিশ্বাস করি। কিছু ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস বলেই কিছু নেই। আমি যা বলি তা আমি **বিশ্বাস** করি না। তা আমি **জানি** (দ্রঃ আল্লাহ্‌র পরিচয়: জাহের ও বাতেন)। বিশ্বাস করি কেবল আল্লাহ্‌কে—কারণ তাঁকে তাঁর Essence কে **জানার** মাধ্যমে জানা যায় না। তা যে জানা যায় না, তাও প্রমাণ সহকারে জানা যায়। বিভিন্ন বইতে তার প্রমাণ দিয়েছি (গাণিতিক প্রমাণসহ)। এই সত্য গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন আমেরিকার দার্শনিক-গণিতবিদ কুর্ট গোডেল (১৯৩১)। হযরত আবু বকর (রাঃ) এজন্য বলেছিলেন যে আল্লাহকে যে **জানা** যায় না, একথা জানতে পারাই তাঁকে জানা। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন—Knowledge is belief proved true. বিশ্বাস যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন তা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। (কথাটি প্রথম বলেছিলেন প্লেটো তাঁর থিয়েটেটাস গ্রন্থ—Knowledge is justified belief.) Epistemology, Research Methodology, Knowledge Management (জ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক শাখা)—সব শাখাতেই এই সংজ্ঞা অকাট্যভাবে স্বীকৃত। আল্লাহ্ কোরআনে **অনেক**

আয়াতেই একথা বলেছেন (আমার Quranic Theory of Knowledge দ্রঃ)। Knowledge creation এর এই inductive/hypothetical/scientific approach কোরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরআনেই বলা হয়েছে যে মানুষ যেন সন্দেহ এবং বিশ্বাস থেকেই কোরআনের সত্যতা অনুসন্ধান করা শুরু করে; এবং তার মাধ্যমে (এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে) সে যদি জানতে পারে যে তা সত্য, তাহলেই সে প্রকৃত জ্ঞানী হবে। মানুষের আদৌ কোনো ধর্মেরই দরকার আছে কিনা তা নিয়েও **এভাবে** চিন্তা করতে বলা হয়েছে। অবশ্য এটা তাদের জন্য যারা "চিন্তাশীল," এবং চিন্তার পথ ধ'রে ছাড়া অন্যভাবে বিশ্বাস করার সুযোগ যাদের নেই [দ্রঃ *গোপন মৃত্যু এবং নবজীবন*—২য় খণ্ড (জ্ঞানকোষ)]।

যারা দর্শন বোঝেন তাদের অভিধানের প্রথম শব্দটাই হলো 'অলৌকিক,' কারণ তারা methaphysics থেকে তাদের যাত্রা শুরু ক'রে rationalism (এমনকি empiricism—বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে) পার হয়ে এর মধ্য দিয়ে knowledge develop ক'রে এগোতে থাকেন metaknowledge এর দিকে, যা আবারও metaphysics এর মধ্যে পড়ে। এক ডাইমেনশনের জ্ঞান হলো তার স্থূলতর ডাইমেনশনের প্রশ্ন/belief/hypothesis/doubt (অবশ্যই scientific doubt)। কোনো বিষয়ের বাস্তব বা বিশুদ্ধ knowledge এর ডাইমেনশনে যেই পৌঁছে যাবেন, দেখবেন যে তা আপনাকে (আরো কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি ক'রে) চালিত করছে উচ্চতর ডাইমেনশনের দিকে। এই 'লোক' (বা স্থান) বা location বা ডাইমেনশনে যা আছে তার cognition-related root রয়েছে তার উচ্চতর 'লোক'-এ। এভাবে একেকটি 'লোক' (plane of knowledge) উচ্চতর 'লোক' এর সাথে বৃত্ত-বৃত্ত বন্ধনে আবদ্ধ নয়—spiral বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে আপনি একটা প্রায়-বৃত্ত শেষ করতে করতেই আবশ্যিকভাবে উচ্চতর প্রায়-বৃত্তে গিয়ে পৌঁছবেন—আপনার logical continuity বিঘ্নিত হবে না। কিন্তু এই spiral নিজের ওপর নিজেই আপতিত। ফলে তা অসীম। তা অসীম বলেই তা 'অলৌকিক'। কোনো একটি বিশেষ 'লোকে' অবস্থান ক'রে তা নিয়ে ঢালাওভাবে মন্তব্য করা সাজে না। কিন্তু যখনই কোনো mystery/potential knowledge/belief/doubt জ্ঞানের সীমানায় চলে আসে, তখন আর তা অলৌকিক থাকে না। এই অলৌকিক বলে কিছু নেই। তাছাড়া গোটা )

spiral (of evolutionary movement) টা তার পূর্ণাঙ্গতার রেফারেন্স নিয়ে অবস্থান করছে মানুষেরই মধ্যে। ফলে মানুষ তার emotional development হওয়ার আগেই যদি এমন কোনো উচ্চমাত্রার abstract জ্ঞান লাভ করে যা লাভ করার কথা তার emotional development এর **পর,** তখন সে প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলেও পরে তার বিস্ময় হারিয়ে ভোঁতা হয়ে যায় এবং সে ভাবে যে সে-জ্ঞান তার নিজস্ব; তা তার দ্বারা অর্জন করার কথাই ছিল। এই অহংকারী বোধটি এজন্য জাগে যে আসলে তা তার মধ্যেই ছিল। যা কারো নিজের জিনিস, তা দেখে সে দূর থেকে অবাক হয় না। এভাবে যথেষ্ট energy ব্যয় না ক'রে, পর্যাপ্ত entropy না ঘটিয়ে, কেউ যদি উচ্চতর জ্ঞান বই থেকে বা গুরুর মাধ্যমে পেয়ে যায়, তহালে তার বাড়তি energy তাকে **অহংকারী** ক'রে তোলে। তার কাছে পরবর্তীতে সত্যকে আর আকর্ষণীয় ব'লে মনে হয় না। Entropy ঘটলে সে যে অবস্থানে পৌঁছে যায় সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। ফলে সে তার জ্ঞানকে আচরণে transform না ক'রে পারে না। কিন্তু entropy না ঘটলে বাড়তি energy তাকে সেই ব্যাপারেও নতুন ক'রে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় যা সে already জেনে ফেলেছে। ফলে তার জ্ঞান তার behavior কে influence করতে পারে না। সে মারেফত জেনেও শরীয়ত মানতে পারে না। তখন অন্তরে যে ব্যাধি হয় তাকে আমি একটি research paper-এ বলেছি Familiarity Syndrome। জ্ঞানের latest development বাংলাদেশে আসে অনেক পরে। চটজলদি এসে পড়ে কেবল technology-র তথ্যাবলী। তা-নিয়ে অল্প-পানির মাছেরা বড় বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় আরেকটা ব্যাধি যার নাম Knowledge Shock বা Modernity Syndrome (আমার ভাষায়)। হঠাৎ ক'রে এমন Culture/knowledge যদি মানুষ পেয়ে যায় যা তার pride বাড়িয়ে দিতে পারে অথচ যা অর্জন করার জন্য সে নিজে সাধনা করেনি, তখন এই ব্যাধি সৃষ্টি হয়। এরই ideological structure কে বলে mistaken modernity। পারতপক্ষে সব যুগেই modernity ছিল। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে এক দল লোক সব যুগে ছিল যারা তাদের নবীদেরকে 'সেকেলে' বলে ঘৃণা করত। আবার এমনও একদল লোক ছিল যারা ধর্মগ্রন্থের বাণীতে জ্ঞানের স্তরে সহজে অভ্যস্ত হয়ে যেত অথচ বিশ্বাস দ্বারা আচরণকে manage করতে পারত না। এদের ছিল Familiarity Syndrome (দ্রঃ আমার Psychololgy of

Knowledge—প্রকাশকের অপেক্ষায়)। এখান থেকে বের হওয়া খুব কষ্টকর। Knowledge দিয়ে তা সম্ভব নয়। তা সম্ভব metaknowledge দিয়ে—আমার knowledge দ্বারা আমি আমার behavior কে manage করতে পারছি না কেন—এই প্রশ্ন দ্বারা লব্ধ knowledge এর মাধ্যমে। কোরআনে এই তাগিদও দেয়া হয়েছে:

> সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতোভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি ওদের পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, **তবুও ওরা কি বিশ্বাস করবে না?**

(সূরা আম্বিয়া: ৩০)

এর প্রশ্নটি লক্ষ্য করুন: **তবুও কি তারা ইমান আনবে না?** অর্থাৎ তাদের knowledge দ্বারা কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হলো। তার পরেও কি তারা ভেবে দেখবে না তাদের জ্ঞান তাদের আচরণকে manage করতে পারছে না কেন? Knowledge এর এই Trap টিকে তারা কি বিশ্লেষণ ক'রে তার metaphysical দিকটা নিয়ে ভাববে না? তবুও কি তারা শুধু knowledge-ই অর্জন করে যাবে? তার সুফলটাকে জীবনে ভোগ করবে না? ফিতরা বা স্বভাবধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে (৩০:৩০) intellectual knowledge এর পাশাপাশি emotional knowledge অর্জন করবে না? উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটিতে তথাকথিত Big Bang Theory -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচের আয়াতদুটির কথা বিবেচনা করুন।

> জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল—এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?
>
> ওরা বলবে—আল্লাহ্‌র। বল—তবুও কি তোমারা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

(সূরা মোমেনুন: ৮৪-৮৫)

তারা knowledge দ্বারা যা জেনেছে তার সমস্ত ইঙ্গিত চ'লে যাচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি। তার পরও তাদেরকে **নতুনভাবে** ভাবতে বলা হচ্ছে। কারণ এখন জ্ঞানের অজ্ঞতা থেকে বের হওয়ার একটাই উপায় আছে—প্রশ্নকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করা। প্রশ্নের ফসলকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। আয়াতদুটির কয়েকটি implication আছে। তার মধ্যে আরেকটি হলো তাদের প্রতি যারা আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গ তুলে এবং তাঁর বাণীর রেফারেন্স দিয়ে তাঁরই তাওহীদের

বিরোধিতা করে। কম্যুনিস্ট জ্ঞানীর এটাই করে। (অন্যান্য ডাইমেনশনের অর্থের জন্য "আল্লাহ্‌র পরিচয়" দ্রঃ)।

আবেগের উৎস হলো প্রেম। স্বভাবধর্মের দিকে যে আবেগ পরিচালিত করে না, তা খারাপ, কারণ তা Knowledge Shock, Familiarity Syndrome, এবং Knowledge Trap সৃষ্টি করে। তখন logic এবং knowledge ব্যবহৃত হয় emotion এর পক্ষে। এর একটি সহজলভ্য উদাহরণ হলো rationalization, যা আমাদের নেতার বেশি করে থাকে। নিচের আয়াতগুলিতে emotion এর কারণে knowledge এবং behavior এর মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

> তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে?
>
> (সূরা ফুরকানঃ ৪৩)
>
> তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? ওরা তো পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম।
>
> (সূরা ফুরকানঃ ৪৪)

এরই ফলস্বরূপ যা হয় তা বর্ণিত হয়েছে নিচের আয়াতটিতেঃ

> অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ (তারাও সমান নয়)। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।
>
> (সূরা মুমিনঃ ৫৮)

কিন্তু স্বভাবধর্মের (৩০:৩০) দিকে অগ্রসর হওয়া কেবল তখনই সম্ভব যখন এই সব বিক্ষিপ্ত emotion কে Positive emotion (=Love) দ্বারা ভেতরমুখী করা হয়। তা শুধু আবশ্যকই নয়, অত্যাবশ্যক। তা যার নেই তার জ্ঞান তার কাজে লাগবে না। এই emotion এর তীব্রতম রূপের কথা আল্লাহ্‌ নিজেই কোরআনে বলেছেনঃ

> বল—তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর বা না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।
>
> তারা বলে —আমাদের প্রতিপালকই পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই।

এবং তারা ***কাঁদতে কাঁদতে*** ভূমিতে লুটয়ে (সেজদায়) পড়ে, এবং এ ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

(সূরা বনি-ইসরাইল: ১০৭-১০৯)

এখন কি অবাক হচ্ছেন? নাকি ঠাট্টা করছেন? আল্লাহ্ বলেছেন:-

"তুমি তো অবাক হচ্ছ, ওরা করছে ঠাট্টা।"

রসূল (সঃ) কে দার্শনিক বলা নিষিদ্ধ। নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলিতে রসূল (সঃ) কে চিন্তাবিদ ও উদ্ভাবক হিসেবে বিবেচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাহলে তো কোরআন রচনার ও ধর্ম উদ্ভাবনের দায়ভার তাঁর ওপর বর্তাবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তিনি কিছুই বলতেন না।

অবিশ্বাসীরা বলে—এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই না। যা সে [মুহাম্মদ (সঃ)] উদ্ভাবন করেছে, অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে, ওরা তো অবশ্যই সীমালজ্ঘণকারী ও মিথ্যা বলে।

ওরা বলে—এইগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে [মুহম্মদ (সঃ)] লিখে নিয়েছে, এইগুলো সকাল সন্ধা তার নিকট পাঠ করা হয়।

বল—এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন—যিনি আসমান ও জমিনের সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

ওরা বলে—এ কেমন রসূল, যে আহার করে, এবং হাটে বাজরে চলাফেরা করে, তার নিকট কেন কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে সতর্ককারীরূপে থাকত?

(সূরা ফোরকান: ৪-৭)

ওরা কি তবে বলে যে—মুহম্মদ এ উদ্ভাবন করেছে। বল—যদি আমি এ উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা এ বিষয়ে যা আলোচনা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট, এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বল—আমি তো প্রথম রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সম্বন্ধে কি করা হবে, আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি এই কোরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, পরন্তু বনি-ইসরাইলদের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে

> বিশ্বাসস্থাপন করলেও তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহলে তোমদের পরিণাম কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা আহ্‌ক্বাফ: ৮-১০)

নিম্নে বর্ণিত আয়াত সমূহে তাঁকে কল্পনাবিহারী ও কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

> নিশ্চয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রসূলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত।
>
> এ কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।
>
> এ কেবল বাক্-চতুরের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
>
> এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।
>
> যদি সে কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত,
>
> আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম।
>
> এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম।
>
> তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না।

(সূরা হাক্কাক্কাহ: ৪০-৪৭)

কারণ কোরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। (৩৮:২৯)-তে বলা হয়েছে যে যার বুদ্ধি নেই সে উপদেশ গ্রহণ করতেই পারবে না। এখন বলুন—What is knowledge? What is understanding? আপনি যা বলেছেন তা কি জেনেশুনে বলেছেন? বরং আপনিই কি আবেগ-তাড়িত হয়ে কথা বলেননি?

দর্শনের মূল কাজ হলো construction, deconstruction, conceputalization, abstraction, reconstruction—তা দ্বারা সত্যকে সন্ধান করার জন্য প্রথমে যৌক্তিক উপায়ে তাকে নির্মাণ করা হয় (construction)। আপনি তো নিজেই বলেছেন যে সত্যকে **আবিষ্কার** করতে হয়, নির্মাণ করা যায় না। তাহলে দর্শনকে আপনি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন? আসলে দর্শনকে ব্যবহার করতে হয় knowledge এর deconstruction এবং reconstruciton এর জন্য, reality-এর নয়। কার্ল মার্ক্স তা করেছিলেন reality এর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তাঁর দর্শনের guiding motivation হিসেবে কাজ করেছিল তাঁর emotion; তিনি

দর্শনের প্রয়োগের logic কে উপেক্ষ করেছেন। অথচ তিনি তাকেই বলেছেন materialism! দর্শনের ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে সাইকোলজির ভিতের ওপর। প্রত্যেকে (অন্তত আধুনিক দার্শনিকগণ) তার দর্শনকে তার স্বভাবের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি Russell এবং Wittgenstein এর ক্ষেত্রে, তাঁরা ছিলেন অন্য প্রান্তে—বিশুদ্ধ যুক্তিতে।

'আহাদ' দ্বিবচন—কারণ আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন—'হুআল্লাহু ফিস সামাওয়াতি অফিল আরদ্বি'—তিনি আল্লাহ্ আকাশে এবং (আল্লাহ) পৃথিবীতে। এক আল্লাহ্ দুই জগতে—দুই ডাইমেনশনে। ইঙ্গিত বিভক্ত, কিন্তু তিনি বিভক্ত নন—এক; পৃথিবীতেও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অনেক মোল্লা ভাবে যে আল্লাহ্ মনে হয় দূর বেহেস্তে বা আরশে একাকী বসে আছেন—এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে তারা 'এক' এর দুইভাগটিকে বোঝে না ('আরশ' আক্ষরিক অর্থেই সত্য, তবে তার প্রসঙ্গে 'দূর' 'ব'সে থাকা' কথাগুলিকে চটজলদি উচ্চারণ ক'রে ফেরার মধ্যে ঝামেলা আছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে গেলে প্রথমে আরশের রেফারেন্সকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। আল্লাহ্র অস্তিত্বই তাঁর আরশ)। তারা বোঝে না যে তিনিই গুপ্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনি দৃশ্য, তিনিই অদৃশ্য, তিনি দয়াময়, তিনি কঠোর (কাহহার)-ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই bipolar বা দ্বিমেরুপ্রবণ (যেমন good থাকলে bad থাকবেই)। তিনি সবকিছুকে জোড়া জোড়া/বিপরীতে সৃষ্টি করেছেন। বিভক্ত নয় তাঁর 'জাত' বা essence। তা সবকিছুকে জোড়া জোড়া/বিপরীতে সৃষ্টি করেছেন। বিভক্ত নয় তাঁর 'জাত' বা essence। তা সমস্ত duality বা দ্বৈততার উর্দ্ধে।

৪ বিয়ের প্রসঙ্গটা এত রহস্যময় যে আপনাকে অল্প কথায় বুঝাতে পারব না। সহজে 'ল্যাঠা চুকানো' যায় না। তাই যদি যেত তাহলে মানবজাতির মধ্যে এত ভুল বুঝাবুঝি থাকত না। প্রকৃতপক্ষে এত ভুল বুঝাবুঝির উৎসই হলো সহজে ল্যাঠা চুকানোর বাসনা। Logic-এ একে বলে hasty generaliztion। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন—মানুষ তর্কপ্রিয়। এবং মানুষ ত্বরাপ্রবণ। অর্থাৎ সেই একই ফল—বিবেচনা না ক'রে ত্বরিত সিদ্ধান্ত।

মুহাম্মদ (সঃ) কে দিয়ে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা হয়েছে, শুরু করা হয়নি। শুধু তাই নয়, মুসলিম শব্দটা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রথম উচ্চারণ করলেও ইসলাম শুরু হয়েছিল হযরত নূহ (আঃ) থেকে যা হয়তো আপনি জানেন না।

ইব্রাহিম (আঃ) **নাস্তিকবাদ** প্রচার করেননি। এই একটা জায়গায় অনেক শরীয়তত্যাগী 'উদারপন্থী' লোক ভুল ক'রে বসে আছে। 'নাস্তিকবা' আর **নাস্তিবাদ'** এক কথা নয়। প্লিয, বুঝার চেষ্টা করুন। যে-কোনো ভালো অভিধান দেখুন, (আপনার কাছে চিঠিটির যে আসল কপিটি আছে তা খুলে দেখুন—আপনি তো আবার আপনার 'প্রিয়' লেখকের কাছে মূল কপি না পাঠিয়ে ফটোকপি পাঠিয়েছেন—আমি হলে যার ঠিক উল্টোটাই করতাম। আপনি নিজেকে কত বড় মনে করেন, তার পরিচয় তো নিজের অজান্তেই এভাবে দিয়ে ফেলেছেন)। তিনি ছিলেন 'নাস্তিবাদ' এর প্রবর্তক। কিন্তু এখানেও অধিকাংশ লোকে ভুল বুঝে বসে আছে। এই নাস্তি আর emptiness বা নিরাকারত্ব এক নয়! নয়! নয়! উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে বাস্তবতা সব একই—একথা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু তার সাথে ধর্মের কোনো সুসম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। ধর্ম অবলম্বন না ক'রেও নিরাকারত্বকে 'লাভ' করা যেতে পারে—অবশ্য এখানে 'লাভ' করা কথাটাই আত্মবিরোধী। কিন্তু ইসলাম সত্য ধর্ম **জেনেও** কেউ যদি তা অবলম্বন না করে, তাহলে সে মুহম্মদ (সঃ) এর উম্মত হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করল না। **ইব্রাহিম (আঃ) মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন নিরাকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়, মানুষের knowledge এর স্থূলতাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য।** নিরাকার স্থায়ী এবং আকার অস্থায়ী। যা স্থায়ী তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করার দরকার কী? সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য তার সংজ্ঞা নিরূপণের আদৌ কোনো দরকার নেই—সেক্ষেত্রে শুধু আমাদের সংজ্ঞা—নির্ভর মানসিকতা থেকে রেহাই পেতে পারাই যথেষ্ট। যা সত্য তা কোনো সংজ্ঞা ছাড়াই, সংজ্ঞা নির্ধারণের আগেই সত্য। আপনি প্রশ্ন করেছেন—'সত্য কী?' এর জবাবে ইব্রাহিম (আঃ) কুড়াল দিয়ে মূর্তির ওপর আঘাত করেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন—মূর্তির প্রশ্ন অনুসরণ ক'রে সত্যের সংজ্ঞা খোঁজার চেয়ে আগে মূর্তিটাকেই ভেঙ্গে ফেল। তাহলে কোনোরূপ সংজ্ঞার প্রয়োজন ছাড়াই সত্য বেরিয়ে পড়বে। অনুশীলন ছাড়া কেবল গালগল্প এবং সংজ্ঞাই জ্ঞানের স্থূলতার কারণ হয়। যিনি অসীম তিনিই নিজেকে সীমায় প্রকাশ করেছেন। এ যুগে এ কোনো গোপন সংবাদ নয় যা জেনে গোপনে পুলকিত হতে হবে। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছিলেন যে, 'কালেমা তৈয়্যেবার অর্থ হলো—আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই।' অর্থাৎ তাওহীদ বা একত্ব। এক মূর্তি (বা নফ্স বা আমিত্ব) সত্য হলে অন্যটিকেও সত্য হতে হয়। ফলে দেহকেন্দ্রিক আমিত্বে-আমিত্বে লাগবে কোন্দল। কিন্তু যখন এই জ্ঞান অর্জন করা হয়ে গেল যে একই সত্তা সব আকারের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন, তখন আকার

এবং নিরাকার উভয় নিয়ে মাতামাতির পালা শেষ হয়ে গেল এবং সেই আচরণবিধি মানা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল যা সমস্ত মূর্তি (আমিত্ব) গুলোকে পরস্পরের সাথে ঐক্যপূর্ণ আচরণ করতে সাহায্য করবে। যিনি নিরাকার তিনিই নিজেকে আকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে সৃষ্টি কখনও মায়ার খেলা নয়। আল্লাহ্ বলেছেন—আমি আসমান ও জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী কিছুকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। নিরাকারকে ধারণ করার জন্য আকারের প্রয়োজন। তা পরকালের ক্ষেত্রেও সত্য। তাইতো পরকালেও দেহে থাকবে। হিন্দু ফিলসফিকে অবলম্বন ক'রে অনেকে এখানে ভুল ক'রে ভেবে ব'লে যে পরকাল ব'লে কিছু নেই। না, তা সত্য নয়। কোরআনে বলা হয়েছে যে, যারা পরকালে বিশ্বাসী **নয়** তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট নয়)। সেই ধর্মে থেকে মুক্তি পাবে দুয়েকজন, কিন্তু অধিকাংশই হবে বিভ্রান্ত। তাছাড়া কোরআনের বাণী তাদের কাছে পৌঁছানোর পর তারা যদি তাকে স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে তাদের মুক্তিই হবে তাদের বন্ধন। ইব্রাহিম (আঃ) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই নেই—এই অর্থে তা **নাস্তিবাদ, নাস্তিকবাদ** নয় (অভিধান দেখুন)। এ কারণে ইসলামে তাওহীদের বা একত্বের প্রসঙ্গটা এত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে বারবার আল্লাহ্র একত্বের কথা বলা হয়েছে—কখনও কি বলা হয়েছে তিনি শুধুই নিরাকার, কিংবা তাঁর নিরকারত্বকে কি আদৌ কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? যারা ঐক্যের মূল বিধান অনুসরণ করবে না, তারা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত কবে। সম্ভবত আপনার গুরু আপনাকে শুধু মারেফতের কিছু অপভ্রংশ দিয়েছেন—দোষ আপনার নয়। তিনি আপনাকে শরীয়ত শিক্ষা দেননি। রসূল (সঃ) তো বলেছেন যে, তাঁর শরীয়ত হলো পর্দাস্বরূপ। তার মানে কী? তার মানে তো এটাই যে সেই পর্দার মধ্যেই রয়েছেন তিনি যিনি নিরাকার, নয় কি? মারেফত **শেখার** বিষয় নয়, **অর্জন** করার বিষয়। নইলে আমাদেরকে পেয়ে বসবে-Knowledge trap। এটাই ইবলিসের বৃত্ত। Vicious Circle of Poverty বা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। আবার এমনও হতে পারে যে হয়তো আপনি আপনার গুরুর কাছ থেকে সঠিক শিক্ষাটা নেননি। নির্জীব নিরাকারত্বের কথা প্রাধান্য পেয়েছে কেবল হিন্দু ধর্মে। গাদা গাদা মূর্তির কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য সেক্ষেত্রে নিরাকারত্বের ধারণাটার গুরুত্ব আছে বটে। কিন্তু ইসলামে আকার-নিরাকার সবকিছুর ঐক্যই আল্লাহ্র জাতকে নির্দেশ করে। তা কোনো সংজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল নয়। আপনি প্রেম বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে কেবল যুক্তি দিয়ে—যুক্তির ছকে ফেলে—বিচার করবেন? তাহলে তো তাকে **আবিষ্কার**

বলে না, তাকে বলে উদ্ভাবন। উদ্ভাবনী পদ্ধতি দিয়ে তাঁর **সন্ধান** পাওয়া যায়, তাঁকে **পাওয়া** যায় না।

তকদীর বলতে আপনি যা বুঝিয়েছেন আমি কি তা বইটির *সেল্‌ফ কন্ট্রোল.......)* ১০৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাতে বলিনি? একটু প'ড়ে দেখবেন কি? Fixed ভাগ্য বলে যা আছে তা আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না। তা নিয়ে একারণেই মাতামাতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। জানতে চাইলে দেখুন—*কোরানের অলৌকিক উচ্চারণ.....এবং গোপন মৃত্যু ও নবজীবন (১ম ও ২য় খণ্ড)।* মনে রাখবেন, একটা পূর্বপরিকল্পনা না থাকলে কোনো ম্যানেজমেন্ট সম্ভব নয়, ভিত না থাকলে ইমরাত সম্ভব নয়। পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য মানুষকে ঠকানোর জন্য নয়, তা কেবল সৃষ্টির structure ধারণ করার জন্য। পূর্বপরিকল্পিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রবাহিত ক'রে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে শেখানোর জন্য। Trial-and-Error প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে Knowledge creation-এর সুযোগ দেয়ার জন্য (আমার *Quranic Theory of Learning* দ্রঃ)। মনে হচ্ছে কোরআনটা ঠিকমত পড়েননি। কিংবা বিশ্বাস করেননি। গুরুই বেহেস্তের পথ দেখাতে পারে, আবার গুরুই ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। আপনি যদি কোনো প্রকৃত গুরুর কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে সঠিক জ্ঞানটাকে নিতেন, তাহলে আপনি একথা বলতে পারতেন না যে পূর্বনির্ধারণ মিথ্যা। সব যদি কর্মবৃত্ত হবে, তাহলে সৃষ্টির প্রথমদিকের ঘটনাগুলো ঘটল কিভাবে? তখন তো কোনো কর্ম ছিল না। তাহলে কোত্থেকে এলো বৃত্ত? আসলে, এমনও আধ্যাত্মিক স্তর আছে যেখানে জানা যায় যে কোথাও কিছু ঘটেনি, ঘটছে না, ঘটবে না—এবং এটাই চূড়ান্ত সত্য। তাই ব'লে কি আপনি সৃষ্টি এবং সৃষ্ট ঘটনাবলীকে অস্বীকার করবেন? আবার প্রকাশিত বাস্তবতার শর্ত এমনই যে, তাতে যা কিছু ঘটছে তার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাই পূর্বনির্ধারিত—হোক সে নির্ধারণ সৃষ্টির আদিকালের কিংবা মাত্র এক ঘন্টা আগেকার। মূল কথা হলো, **আমাদের অনুভূতি বাস্তবতার যে স্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তার আবশ্যিক সার্বিকতাই আমাদের জন্য সেই স্তরের জন্য সত্য।** 'ভাগ্য নেই' স্তরে যিনি পৌঁছেছেন, তিনি তাকে সেকথা শুনাতে পারেন না যে এখনও ভাগ্যের হাতে বন্দি। এরূপ বলেন কেবল নামাজ-ত্যাগী (আমি আনুষ্ঠানিক নামাজের কথাই বলছি, ধ্যানের কথা নয়! যদিও আপনি আমাকে মৌলবাদী বলবেন) গুরুগণ। তাঁরা নিজেরা *মনে মনে* পার পেলেও অন্যদেরকে—বিশেষত সমাজকে—পার করার পদ্ধতি জানেন না। এজন্য ইসলামে পাঁচটি ভিতকে আক্ষরিক অর্থে রাখতেই হবে, বিকৃত করা চলবে

না। তথাকথিত শূন্যতা ও নিরাকারত্ব মানুষকে অনেক বিভ্রান্ত করেছে। শূন্যতা (Emptiness) হলো প্রথমত একটি অভিজ্ঞতা, পরে এমনকি অভিজ্ঞতা থেকেই রেহাই। প্রথমত তা একটি **উপায় মাত্র,** কারণ নিজেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতা-শূন্য না করলে সত্যে স্থির হওয়া যায় না। কিন্তু শূন্যতাকে কেউ লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে যে-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে, তা গণমানুষের জন্য নয়। বৌদ্ধরা তো শূন্যতায় বিশ্বাসী। তাদের কি হাল? তাদের মধ্যে মুক্তি পান অল্প কিছু ব্যক্তি। এদিকে ইসলাম বস্তুকে স্বীকার ক'রে নিয়ে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রাখে নিরাকারত্বকে, শূন্যতাকে নয়—বরং নিরাকারত্বকেও নয়, **ঐক্যকে।** কিন্তু এই ঐক্যকে যারা মনন ও আচারণে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, ঐক্যকে শুধু এক জাতীয় গাণিতিক, **নির্জীব** নিরাকারত্ব ভাবে, তারা কেবল লেবাস-দাড়ি নিয়ে প'ড়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন—বিধানের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ কর। একেক মনের aptitude এবং ability অনুসারে তার কাছে একেকটা উপায়কে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হবে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু নিরাকারত্বের মারেফত নিয়ে প'ড়ে থাকলে সেই ধর্মের ভিত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু নিরাকারত্বের মারেফত নিয়ে প'ড়ে থাকলে সেই ধর্মে গোটা সমাজের কোনো কাজ হবে না। সম্ভবত আপনি শুধু ধ্যান করেন, নামাজ পড়েন না। দেখুন—যিনি একই সাথে নামাজ পড়েন **এবং** ধ্যান করেন, তার কাছে তাদের ধর্মবোধ এবং সততা-মিশ্রিত বোকামিটাও ধরা পড়ে যারা শুধু ধ্যান করে কিন্তু নামাজ পড়ে না। নামাজবিহীন ধ্যান **অধিকাংশ ক্ষেত্রে** কল্পনা থেকে রেহাই পাবার বা মন স্থির করার কল্পনায় পর্যবসিত হয়। তখন ব্যক্তি আল্লাহকে শুধু 'কল্পনায়' স্থান দিতে পারে। আল্লাহ বলেছেন যে দৃষ্টি তাঁকে দেখে না, চিন্তা কল্পনা তাঁকে পায় না। অথচ আপনি এতদিন পর তাঁকে সেই পরিত্যক্ত কল্পনাতেই স্থান দিলেন? অথচ তিনিই পরম বাস্তবতা (আল্-হাক্ব)! চিন্তা যদি বাস্তবতাকে না পায় তাহলে সে দোষ চিন্তার, বাস্তবতার নয়।

পাপের সংজ্ঞা পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিক এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এদের মধ্যে আসল কথাটা কেউ বলেননি। একমাত্র কোরআনেই তার আছে। কোরআন অনুসারে—**পাপ হলো নিজের ওপর জুলুম করা।** ব্যাখ্যায় যেতে পারব না। আমার *Philosophy of Ethics* দেখুন। বর্তমান বিজ্ঞানের Ecology (এবং Environmental Science) শাখা পাপের এই সংজ্ঞার একেবারে কাছাকাছি গিয়েছে। কষ্ট ক'রে দেখলেও দেখতে পারেন—যদিও এসব আমার কাছ থেকে আশা করা বাতুলতা মাত্র।

*নারীর মন* একটি descriptive study। তাতে শুধু কিছু বাস্তব দিককে গল্পের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। যাবতীয় বিষয়কে এক সমতলে এনে coordinate করা হয়নি। তা করার ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় খণ্ডে। আপনি এযাবত কেবল বাস্তবতার একটা দিককে দেখেছেন। তবে যা দেখেছেন তাতে চুলমাত্রও মিথ্যা যে নেই, তা নিজের মনের গভীরেও জানেন। কিন্তু কেন তা সত্য, কী তার implication, তা জানেননি বলে এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে। .......*সেল্‌ফ কন্ট্রোল* .......এ তার অপর দিকটাও কিছুটা আলোচিত হয়েছে। আপনাকে একটা test দেই: যারা সত্যিকার অর্থেই সাধক, তারা মানব মনের **সবকিছুরই** ব্যাখ্যা জানেন। কারণ তাদের প্রথম দায়িত্ব থাকে মনকে অতিক্রম করা। তা করতে গিয়েই তারা তা জেনে ফেলেন। তাদের কেউ কেউ **বাহ্যিকভাবে** জ্ঞানী হওয়ার কারণে তা বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, কেউ বা তা পারেন না। কিন্তু ফল হয় একই। আপনি যখন কখনও সঠিক গুরু খুঁজে পান, তো দেখবেন যে তাঁর কাছে বসলেই আপনার প্রশ্নের এবং জ্ঞানের তৃষ্ণার অনেকখানি মিটে যাবে। বকবক করা লাগবে না। তার পরের test হলো: সত্যিকারের সাধকের মগজে এবং আবেগে জ্ঞান ও অনুভূতি পূর্ণাঙ্গতাপ্রবণ হতে থাকে (যে প্রক্রিয়া অনন্তকাল চলতেই থাকে)। ফলে তাঁর কাছে কোরআন তার **সঠিকতাকে** ধাপে ধাপে প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে তাঁর জ্ঞানের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে উঠতে থাকে। এজন্য হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেন যে, কোরআনকে যে বুঝতে পারল সে জগতের সবকিছুর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারল। সুতরাং আপনার গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান নেয়ার আগে তাঁকে ভালোবাসুন (যদি তিনি সঠিক পথে থাকেন—আমি টুপি দাড়ির কথা বলছি না), সংকীর্ণতাহীন ভালোবাসা—যার ফলে অন্যের গুরুর প্রতি হিংসা না আসে। সঠিক গুরুর কাছে গেলে মন উদার হয়, ব্যাখ্যা ছাড়াই রহস্য জানা যায় কিংবা প্রয়োজনে ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। আমি তাঁদের পায়ের ময়লা মোছারও যোগ্যতা রাখি না যাঁরা সঠিক গুরু। কিন্তু আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি। আমি ব্যক্তিগত জীবনে এমন একজন গুরু পেয়েছিলাম, যিনি এখনও রয়েছেন আমার হৃদয়ে।

আমি আরজ আলী মাতব্বর সাহেবের মুখোমুখি হলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কাউকেই অশ্রদ্ধা করিনি। (হয়তো বা এ কারণে আমার ছোটবেলার বন্ধু থেকে শুর ক'রে বর্তমানের বন্ধু এবং সিনিয়র শুভাকাঙ্খীদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়েছেন বা অনেকে তওবা করে ধর্মে এসেছেনা। আমি তবলিগী নই।

ইনকিলাব গ্রুপ আমাকে পছন্দ করে না। আপনার মতো মুক্ত-চিন্তার লোকেও নয়)। কিন্তু প্রচারের প্রচারের ক্ষেত্রে তীব্র সমালোচনা আমাকে করতেই হবে। কারণ তার চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক জ্ঞানাণ্বেষী জ্ঞানেরই বৃত্তে আটকে যাচ্ছে। ফলত আমি তাঁকে যখন সমালোচনা করছি, তখন **প্রেমের** সাথেই করছি। আপনার হাসি পাচ্ছে? বিড়ালকে আদর করা মানে তো ইঁদুরের মৃত্যুর কারণ হওয়া, এবং ইঁদুরকে আদর করা মানে বিড়ালের কষ্টের কারণ হওয়া, নয় কি? হ্যামলেটের মুখ দিয়ে শেক্সপীয়র বলেছিলেন—I want to be cruel to be kind। আমার আর কী করার থাকতে পারে? প্রেমই পুরস্কার, প্রেমই শাস্তি। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বান্দার জন্য শুধু আছে প্রেম (দ্রঃ Love Theory of Punishment—*গোপন মৃত্যু এবং নবজীবন* ২য় খণ্ড)। কিন্তু বান্দার কৃতকর্মের জন্যই তা শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি আক্রোশপূর্ণ হলে আল্লাহই তাই-ই তাকে ফেরত দেন। আল্লাহ্‌ বলেছেন—আমিই শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী। ....ওরা কৌশল করছে; আমি কৌশল করছি। —অর্থাৎ তিনি আমাদের কৌশলের মধ্যে ঢুকে পড়েই আমাদের কৌশলকে আমাদের দিকে ফেরত পাঠাচ্ছেন (আমার Concept of Generic Strategies in the Quran দ্রঃ)। এই অর্থে 'আক্রোশ' শব্দটা ব্যবহার করেছি। তাছাড়া বইটিতে পূর্ববর্তী অংশে বহুভাবেই বলেছি যে তিনি শুধু প্রেমই করেন।

এখানেই বিশুদ্ধ প্রেমের test। তা কারো কাছে আবেগ বলে মনে হয় এবং তার অহংকারে আঘাত করে, আর কারো কাছে সুধা ব'লে মনে হয়। সত্য এভাবে মিথ্যা থেকে আলাদ হয়ে পড়ে। কোরআনের বাণী এভাবে কারো অহংকারে আঘাত করে, কারো বা বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়িয়ে দেয়। এজন্য তার নাম ফোরকান। আপনি আল্লাহ্‌র কঠোরতাকে মেনে নিতে পারছেন না, এটাই বড় বিদ্রোহ।

ধর্মের বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে দেখলে বলা যায় যে মাতব্বর সাহেব তেমন কোনো অপরাধজনক কথা বলেননি বা কাজও করেননি। তিনি ধর্ম বিষয়ক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই বলতে হবে যে তিনি বড় ধরনের সমস্যা ঘটিয়েছেন। তিনি এমন কিছু প্রশ্নকে বাজারজাত করেছেন যা রাজা থেকে ফকির সবার মনেই জাগে। যে প্রশ্ন সবার মনে জাগে তা তো গোপন কিছু নয়। কিন্তু সবার মনে কেন তা জাগে? কারণ কারো কাছে তার জবাব নেই। সুতরাং একজন জ্ঞানসাধকও যদি বারবার সেই প্রশ্নের ডামাডোল বাজাতে থাকেন এবং নিজে তার কোনো জবাব না দিয়ে শুধু

প্রশ্নের সমাহার থেকে যে টোন উঠে আসে তার দ্বারা একটা গুমোট বা ঘোলাটে আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে নিজেরই চারদিকে একটি ঘূর্ণিব্যাত্যা সৃষ্টি করেন, এবং এভাবে নিজেকে দর্শনীয় ক'রে তোলেন, তাহলে তা তেমন মানানসই হয় না। কারণ সেরূপ দার্শনিক অমিতাচার সাধারণ মানুষকে খুব বেশি বিভ্রান্ত করে। যা সবাই জানে, তা তাদেরকে নতুন ক'রে জানাবার কিছু নেই, যদি না তা নতুন ক'রে বলা যায়। আমি নিশ্চয়ই কখনও আপনাকেই বলতে যাব না আপনার নাম কী, যাব কি? আল্লাহ বলেছেন—শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না। সমাজকাঠামোকেও তো তবুও একটি সীমার মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া যায়। কিন্তু মনের  মৌলিক বিশ্বাসের কাঠামোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকলে তাতে বড় অনিষ্ট ঘটে। মানুষের মনে প্রশ্নের উপস্থিতি তাতে আসন্ন বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখে। কিন্তু সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলে তার বিনিময়ে বরং অর্জিত হয় দীর্ঘস্থায়ী স্থিরতা। মাতব্বর সাহেব যে মুক্তচিন্তার চর্চা করেছিলেন বা জ্ঞানসাধনা করেছিলেন ব'লে আপনারা মনে করেন, তা ঠিক, যদি প্রসঙ্গটিকে শুধু সেই সব লোকদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয় যাদের মন ও জ্ঞানের বিকাশের স্তর তার মতো। কিন্তু তার চেয়ে যারা নিম্নতর বা উচ্চতর স্তরে রয়েছেন, তাদের জন্য তা হয় ক্ষতিকর না হয় বিরক্তিকর না হয় অর্থহীন। তা ক্ষতিকর সাধারণ মানুষের জন্য—যারা তথ্যে আকৃষ্ট হয় অথচ যাদের যৌক্তিক-মানসিক কাঠামো বিকশিত নয়। তা বিরক্তিকর তাদের জন্য যারা ধর্মের সেন্টিমেন্টটা নিয়ে বেশি ব্যস্ত। তা অর্থহীন তাদের কাছে যারা জানেন যে মাতব্বর সাহেব কথা বলেছেন প্রচুর কিন্তু বুঝিয়েছেন কম। আসলে, একবার ভাবুন তো কী করেছেন তিনি? তিনি যা রচনা করেছেন তা তো মাত্র ৫/১০ দিনের মধ্যেই একজন সাধারণ জ্ঞানী মানুষ এক বা একাধিক বিশ্বকোষ (Encyclopedia) ঘাটাঘাটি ক'রে লিখে নিতে পারে। তথ্যের অভাব তো পৃথিবীতে বহুকাল ধ'রে নেই। শুধু কিছু তথ্য এনে জড় করলেই কি হলো? তাহলে তো বলতেই হয় যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হলো কম্পিউটার, ইন্টারনেট, DSS (Decision Support System), ES( Expert System) এরা। আপনি তাকাচ্ছেন knowledge এর দিকে, যার কাঁচামাল হলো information বা তথ্য, অথচ আমি তাকাচ্ছি wisdom এর দিকে, যার কোনো কাঁচামালই নেই, তা নিজেই পাকা—তা informaiton, emoiton, purpose কে একত্রে মিলিত করেছে consciousness এর সাথে, যার ফলে তা মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়কে একীভূত করে এবং কাজের মধ্য দিয়ে রূপান্তর লাভ করতে

পারে। থাকে না কোনো Assimilation Gap (দ্রঃ Leading by Managing the Unconscious—S.M.Z.H)। দেখুন ভাই, আমরা তো নৈর্ব্যক্তিক গবেষণার যুগের মানুষ। আমরা একটি N.G.O.-র কাজের সামাজিক ফলশ্রুতি নির্ণয় করার জন্যও ব্যয়বহুল রিসার্স করি। কী করি আমরা তাতে? সাধারণ মানুষ যা জানে বা যা চায় বা যা অনুভব ক'রে তাই লিপিবদ্ধ ক'রে জড়ো করি। তাহলে আপনাকে আমি একটা রিসার্স টপিক দেই। মাতব্বর সাহেবের বই যারা পড়েন, তাদের বিশ্বাস, ধর্ম সম্পর্কিত মনোভব, চরিত্র, ও ব্যক্তিত্ব কি বিশেষ Functional Definiton অনুযায়ী 'অন্যদের থেকে আলাদা? অবশ্যই তাই। আপনি শুধু সামান্য খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন। তিনি অনেক তরুণ মনকে তথ্যের ডাস্টবিন বানিয়ে অহংকারী ক'রে ছেড়েছেন। সেই ডাস্টবিন থেকে দূর্গন্ধের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে গাদাগাদা প্রশ্ন। অথচ প্রশ্নের ইঙ্গিতই যেন তাদের কাছে উপভোগ্য। জবাব খোঁজার সঠিক  পথে তারা চলছে না। চমৎকার আলোচনা করছে এবং অবশেষে কেবল আলোচনার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপছে। একটি দিন মাত্র আপাতত আজিজ সুপার মার্কেটে গিয়ে তাদের তত্ত্বযুদ্ধ দেখে আসতে পারেন। আমাদের দেশে এরূপ বাক্য-সার পণ্ডিতদেরকে কি বহু আগে থেকেই আঁতেল বলা হয় না? আর এই উপাধিটা তো সচরাচর পেয়ে থাকে কমুনিস্টরা, নয় কি? কারণ কি? বিজ্ঞানীদেরকে তো আঁতেল বলা হয় না। তাহলে? আসলে, কমুনিস্টরা জ্ঞানের মসলা সংগ্রহ করে বিজ্ঞান থেকে, অথচ সেই জগাখিচুড়ি দিয়ে সাজাতে চায় কেবল মানবজীবনের একটি দিককে—মূল্যবোধকে (values)। তাতে সিদ্ধান্তগুলো মাঝে-মধ্যে মুখরোচক হয়ও বটে। কিন্তু মূল্য বোধের সাথে আচরণ ও নিয়ন্ত্রণ জড়িত। তার ধার না ধেরে কেবল মসলা সাজাতেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে ক'রে এক পর্যায়ে খাবার হয়ে পড়ে বিস্বাদ, কখনো কখনো বিষাক্ত। তারা নিজেরা তা চোখে না দেখে চাপিয়ে দেয় জনগণ ও সিস্টেমের ওপর। তীলে তীলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে সত্যকে আবিষ্কার করতে থাকার সাথে সাথে যদি আচরণেও তার ধারাবাহিক (continuous না হলেও continual) প্রয়োগ ও যাচাই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলেও হয়তো দূর ভবিষ্যতে কাজ হতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বে তারা এভাবেই তাদের ভুল থেকে মূল্যবোধ শিখছে। তাতে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হলেও তারা এগোচ্ছে লাভের দিকে। ঘুরেফিরে দৃশ্যপটে চ'লে আসছে ইসলামের সামাজিকতাগুলো। কিন্তু কমুনিস্টরা তো এমনকি স্পিরিচুয়ালিটিকেও তাদের দর্শনভুক্ত ক'রে নিয়েছে, অথচ বলছে যে উদারতার ব্যাপারেই তারা কট্টর মৌলবাদী। ফল হচ্ছে কী?

তাদের কথা এগিয়ে যাচ্ছে, কাজ এগোচ্ছে না। তাদের দ্বারা আর কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। কাজ করতে গেলে আপনাকে decision making করতেই হবে, হোক তা ভুল। কিন্তু শুধু তত্ত্ব আর তথ্য নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে তো আঁতলামি এসেই পড়বে। তখন সিদ্ধান্তগুলো শুধু পিছোতেই থাকবে—আজ নয়, কাল নয়, অন্য দিন, অন্য কোনো দিন আমি বিশ্বাসী হয়ে ওঠার কথা ভাবব। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন—ওরা কি বিশ্বাস করবে না ব'লে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে?—যাহোক, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রসঙ্গে এই লেখা সহ অন্যান্য লেখায় আমি যে psychology-র philosophy দিয়েছি, তা এখনও পর্যন্ত কেউ দেয়নি। তাহলে কি আপনি আমাকে হিংসা করবেন? অথচ এ জ্ঞান আল্লাহ্‌র—এ এসেছে কোরআন থেকে। এ নিয়ে তো আমার নিজেরই অহংকার করার কিছু নেই। অবশ্য প্রভুর জন্য নিন্দা সহ্য করাও গোলামের ইবাদতের একটি বড় অংশ।

আমি কোনো ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি না। আমার একমাত্র ফিলোসফি হলো প্রেম। অন্যান্য ফিলোসফি হলো জ্ঞানার্জনের উপায়মাত্র, **পটভূমি নয়।** হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রহঃ) এর কাছে একবার এক সাধক একটা ফিলোসফির বই নিয়ে গেলে তিনি তা ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ কী? কারণ তা অযোগ্য হাতে পৌঁছে তার মনে Knowledge Trap সৃষ্টি করে। পাঠকের মধ্যে কিছু আছেন যারা তথ্যভুক। তারা বই-পুস্তকের রেফারেন্স খুব পছন্দ করেন। আল্লাহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশকে আবশ্যক ও সুবিধাজনক ক'রে দেয়ার জন্য কিছু মেধাবী লোককে এভাবে তথ্যাকৃষ্ট এবং পক্ষপাতহীন মনোভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের প্রবণতাকে সম্মান করা কর্তব্য ব'লে মনে করি। তা না হলে ঘরে যত ফিলোসফির বই আছে সব অন্য কাউকে দিয়ে দিতাম। আল্লাহ্ বলেছেন 'হেকমত' প্রয়োগ ক'রে ধর্ম প্রচার করতে। নইলে সেগুলো দিয়ে আমার এখন আর কোনো লাভ নেই। প্রধানত কোরআন হাদীস গণিত বিজ্ঞান যুক্তিবিজ্ঞান এবং sociology-র applied শাখাগুলোর রেফারেন্সই আমি বেশি পছন্দ করি।

আপনি বৃক্ষ দেখেছেন। গোটা বনটা দেখেননি। দুটোই দেখা দরকার। আমি তুচ্ছ এক কেঁচো। এমনকি সুনামও পছন্দ করি না। তার প্রমাণ তো আপনার পাবারই কথা। প্রকাশক থেকে শুরু করে বই বিক্রেতা কেউই আপনাকে আমার ঠিকানা বা ফোন নম্বর দিতে পারবে না। আপনি কি পেরেছেন আমার ঠিকানা যোগাড় করতে? তা যে পারেন নি, তার সাক্ষ্য তো

আপনার চিঠিতেই দিয়ে রেখেছেন। নিজেকে প্রচার করার ইচ্ছা থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই করতাম।

আমার সম্বন্ধে আপনার আগের ধারণার সাথে এখনকার ধারণার পার্থক্য হওয়াতে আপনি আশাভঙ্গের দুঃখ পেয়েছেন। ফলে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার সাথে যুক্ত হয়েছে এমন কিছু নফ্‌সের হতাশার এবং জ্ঞানের অস্থিরতার যার উৎস আপনি নিজে নন, কিংবা যা জ্ঞানার্জনের প্রথম পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী। তার ওপর যুক্ত হয়েছে একটি নৈতিক ভয়—হয়তোবা আমার দ্বারা আপনার এবং আপনার ideology-র ক্ষতি হবে। ফলে আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমি আপনার কথায় দুঃখ পাইনি। সামান্য দুঃখ তো যে-কোনো মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারও বটে। তবুও আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাই।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমি নিজস্ব শত্রুতা বোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো বইতে কখনও কারো সমালোচনা করিনি। যদি কোনো ক্ষেত্রে তেমনটি মনে হয়ে থাকে, তাহলে তা আমার ভাব প্রকাশের অপারগতা। যেমন আমি রাসেলের মতো দার্শনিককেও ‘মূর্খ’ বলেছি একটি জায়গায়। তা এজন্য যে তাঁর জ্ঞান তাঁকে পথ দেখাতে পারেনি—তাঁর কতকগুলি preconception এর কারণে: তিনি সত্যকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর নির্মাণও ছিল চমৎকার—নিঃসন্দেহে চমৎকার, তবে নিজের নির্মাণকে কিছুটা ভালোবাসা গেলেও তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা সম্ভব নয়। নিজের যৌক্তিক নির্মাণকে perfect হিসাবে জানতে পারলেও তাকে ধর্মবোধ হিসাবে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ নির্মাণের (construction) শেষ নেই। সেই **নির্মানের ক্ষমতা যাকে দেয়া হয়েছে, তার কাছে শুধু নির্মাণ করতে থাকাকেই ধর্ম ব’লে মনে হবে।** ফলে সে প্রক্রিয়ায় থাকবে না কোনো সমাপ্তি। সম্ভব হবে না আত্মসমর্পণ। এই কথাগুলিই প্রমাণ করে যে, যে-ধর্মের জন্য কোনো নবী জীবনের সব ত্যাগ করেছেন, নির্যাতিত হওয়াকেও সাদরে বরণ ক’রে নিয়েছেন, তিনি তা নিজে নির্মাণ করেননি। তা আকাশ থেকে প্রেরিত। কোরআনে আল্লাহ্ যে-সব জ্ঞানীকে মূর্খ বলেছেন, রাসেল সেই অর্থে তাদের দলভূক্ত। আমি সেই অর্থে, আমিত্বের সংযোগ ছাড়াই তাঁকে এই ভাষায় কঠোর সমালোচনা করেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল মানবের যৌক্তিক নির্মাণ প্রচেষ্টার অপরাগতাকে নির্দেশ। রাসেলের মতো শক্তিশালী মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও অপারগতার তুলনা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় ইতিহাস বৈকি।

যাহোক, আধ্যাত্মিকতার অনেক কিছুকে তার সঠিক গুরুত্বে উপস্থাপন করতে গেলে কখনও কখনও বক্তব্যে শুষ্ক কঠোরতার প্রয়োজন হয়। নফসের ওপর আক্রমণ করার জন্য এই tone এমনিতেই চলে আসে। আমি এরূপ tone যখনই ব্যবহার করি, তখনই নিজেকে সামনে রেখে তা করি। তবুও কোনো কঠোর tone ব্যবহার করার সময়ে প্রতিবারই আমার হাত কেঁপেছে। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে সন্ধান করেছি এমন একটি রচনারীতি যার সাথে আবশ্যিক কঠোরতাগুলি স্বাভাবিকভাবেই খাপ খাবে। এভাবে বেছে নিয়েছি 'গুরু-শিষ্য' সংলাপের স্টাইল। আল্লাহ্ করুণা ক'রেই পথটি দেখিয়েছেন। এখন থেকে কঠোরতাগুলো পাঠকের কাছে পরোক্ষ মনে হবে ব'লে অনেকেরই আমিত্বে আঘাত করবে না। তা ছাড়া সত্যকে রূপকের মধ্যে প্রবেশ করালে তা গ্রহণযোগ্যভাবে কোমল হয়ে যায়। পরবর্তী বইগুলিতে এজন্য গল্পের আশ্রয়েই কঠোর কথাগুলি বলব। ব্যক্তিগতভাবে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, আমি যাবতীয় কঠোরতা প্রথমে আরোপ করি নিজের ওপর। লেখালেখি যদি না করতাম, তাহলে তার কারণে অন্যের ভুল বুঝাবুঝির ঝামেলাও সৃষ্টি হতো না।

আমি আপনাকে কিছু বই (আমার লেখা) পড়তে বলে হয়তো বেয়াদবিই করেছি। কিন্তু আমার **পর্যাপ্ত** সচ্ছলতা থাকলে আমিই বইগুলো কিনে আপনার জন্য পাঠিয়ে দিতাম। সৌজন্য কপি যা পাই, তার স্টক শেষ। আমি ব্যবসা করি যেসব বই লিখে সেই লাইনেই আমি আপনার 'প্রিয়' লেখক। অর্থাৎ ইংরেজির লাইনে। ধর্মের বই আমি ব্যবসার জন্য লিখি না। আমার প্রকাশকরাই আমাকে শাসিয়ে থাকেন—বাণিজ্যিক বই লিখছেন না, কেবল 'দেশ উদ্ধার' করেছেন; সংসার চলবে কিভাবে?

মায়ের কাছে মামা-বাড়ির গল্প বললে বাংলার মানুষ বুঝে ফেলে যে সন্তানের জ্ঞানের অহংকার হয়েছে। Idiom টা দিয়ে আমরা সচরাচর এও বুঝাতে চাই যে সন্তান তার মামার বাড়ি সম্বন্ধে এই নতুন জানল। এসব বিষয় অবশ্য আমাকে বেশি ভাবায় না। আমাকে ভাবায় একটি বিষয়—যে সন্তান তার মায়ের কাছে মামা বাড়ি গল্প বলতে গেল, সে তার নিজের জ্ঞান নিয়ে যতই গর্ব করুক না কেন, এবং সে মায়ের চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছে ব'লে যতই মনে করুক না কেন, তার সবচেয়ে বড় লোকসান এবং ব্যর্থতা হলো এই যে, সে তার মাকেই ছোট করে দেখল, তার মাকেই চিনল না। আপনি যাকে তাচ্ছিল্যভরে সমালোচনা করেছেন, এমনও হতে পারে যে সে আপনাকে আপনার অনেক বন্ধুর চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সমালোচনার

মধ্যে দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনে তীব্রতাও থাকা দরকার, তবে অজ্ঞতাপ্রসূত তাচ্ছিল্য বা অহংকার-প্রসূত আক্রোশ বা হিংসা-প্রসূত অবমাননা থাকার কি দরকার? একমাত্র প্রেমই যার অস্ত্র, তাকে হিংসা করলে নিজের মনের মধ্যেই শান্তি পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

আল্লাহ্ হাফেজ।

এস. এম. জাকির হুসাইন।